গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

জেলা তথ্য ঃ চট্টগ্রাম

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন
এবং
মোঃ সাইদ ইফতেখার

জানুয়ারি, ২০০৫

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস
সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প

জেলা তথ্য :
চট্টগ্রাম

প্রকাশকাল :
জানুয়ারি, ২০০৫

প্রকাশনায় :
পিডিও-আইসিজেডএমপি
সায়মন সেন্টার (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা)
বাড়ি : ৪ এ, রোড : ২২
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২।
ফোন : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪, ৯৮৯২৭৮৭
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪
ই-মেইল : pdo@iczmpbd.org
ওয়েব সাইট : www.iczmpbangladesh.org
ও
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)
বাড়ি : ১০৩, রোড : ০১
বনানী, ঢাকা ১২১৩।

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস - সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিডিও-আইসিজেডএমপি) বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত একটি বহুখাতভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগ, যেখানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হচ্ছে মূল মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) মূল সংস্থা।

মুদ্রন সহযোগিতায় :

ISBN :

তথ্যের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নের একটি প্রয়াস
জেলা তথ্য : চট্টগ্রাম

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি অন্য অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র। একদিকে প্রকৃতির অপার সম্পদ অন্যদিকে প্রকৃতির বিরূপতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ অঞ্চলের ১৯টি জেলার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এ লক্ষ্যে পিডিও-আইসিজেডএমপি প্রকল্প একটি নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করেছে। কর্মকৌশলগুলোর ভিত্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ কার্যকরি করতে উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি জেলার প্রতিটির জন্য একটি করে তথ্য বই লেখা হয়েছে যাতে করে জেলার জনগণ স্ব-স্ব জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারবে।

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন এবং মোঃ সাইদ ইফতেখার যৌথভাবে এই বইটি লিখেছেন। অন্যান্য যারা এই বই লিখতে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন মহিউদ্দিন আহমদ ও ড. মোঃ লিয়াকত আলী। অক্ষর বিন্যাস ও লে- আউটে সহযোগিতা করেছেন মোঃ নুরুজ্জামান মিয়া।

বইটির পর্যালোচনাসহ মতামত দিয়েছেন পিডিও ও ওয়ারপো-র বিশেষজ্ঞ বৃন্দ। এ ছাড়া চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ মতামত দিয়ে বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ড. এম. রফিকুল ইসলাম বইটি লিখতে সার্বিক পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জেলাভিত্তিক। ঐতিহ্যগত ভাবেই মানুষের জেলাভিত্তিক পরিচয় রয়েছে। অপরদিকে জেলাগুলোরও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রও জেলা। অন্যদিকে উপকূলীয় জীবনমানের উন্নয়নের জন্য জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত উপকূলীয় অঞ্চল নীতিমালায় রয়েছে।

সমন্বিত উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনার মূল নীতি হল জনগণের অংশগ্রহণে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়নে জেলাভিত্তিক উদ্যোগকে কার্যকর করতে প্রয়োজন জেলার জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। তাই, জেলার জনগণকে তাদের নিজ নিজ জেলার অবস্থা, অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য জেলাভিত্তিক এই বই লেখা হয়েছে। উপকূলীয় ১৯টি জেলার জন্য আলাদা আলাদা বই লেখা ও প্রচার করা হচ্ছে।

এই বইটি লেখা হয়েছে চট্টগ্রাম জেলার জনগণকে উন্নয়ন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট করার জন্য। এতে রয়েছে জেলার প্রাকৃতিক সম্পদের বর্ণনা, ভৌত ও মানব সম্পদের বর্ণনা এবং ভবিষ্যতে এ সম্পদের অবস্থা কী হতে পারে সেই বর্ণনা।

এই বই-এর প্রধান অংশগুলো হচ্ছে 'সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা' এবং 'সম্ভাবনা ও সুযোগ'-এর উপর বিশদ বর্ণনা। এই বর্ণনার তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে অন্যান্য অংশে। তাই জেলার সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো জেনে নিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনায় আগ্রহ সৃষ্টি ও অবদান রাখতে এই বই জনগণ তথা উন্নয়ন অংশীদারদের সাহায্য করবে।

তা ছাড়াও 'উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ' আলোচনা এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহায়ক আলোচনায় এই বই সহায়তা করবে বলে আমরা আশা করি।

এই বইয়ের জন্য তথ্য নেয়া হয়েছে প্রধানত বিবিএস-এর বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এর পরেই সবচেয়ে বেশি তথ্য এসেছে প্রকল্পের বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এ ছাড়াও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাপিডিয়া, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ আবহাওয়া পরিদপ্তর থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে।

সাহায্য নেয়া হয়েছে চট্টগ্রামের উপরে লিখিত বিভিন্ন বই থেকে -

১. বি.বি.এস., ২০০২। কৃষি শুমারী ১৯৯৬ : জেলা সিরিজ চট্টগ্রাম। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ঢাকা, আগষ্ট, ২০০২।

২. ওয়াজেদ, আবদুল, ২০০২। বাংলাদেশের নদীমালা। পালক পাবলিশার্স। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০২।

৩. দেববর্ম্মা, চৌধুরী শ্রীপূর্ণচন্দ্র, ২০০৪। চট্টগ্রামের ইতিহাস। গতিধারা। ঢাকা, মার্চ, ২০০৪।

৪. PDO-ICZMP, 2001. Inventory of Coastal & Estuarine Island & Char lands (Draft Report), Program Development Office for Intergrated Coastal Zone Management Plan Project; Bangladesh. Dhaka, Augus, 2001.

৫. CEGIS, 2004. Vulnerability Analysis of Major Livelihood Groups in the Coastal Zone of Bangladesh, Final Report, Centre for Environmental and Geographic Information Services. Dhaka, May 2004.

৬. Rizvi, S.N.H., 1975. Banglaesh District Gazetteers Chittagong, Establishment, Division, Government of the People's Republic of Bangladesh. Dhaka, 1975.

তথ্য নেয়া হয়েছে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে চট্টগ্রাম জেলার উপর প্রকাশিত সংবাদ ও নিবন্ধ থেকে।

এ ছাড়াও বইটির বিশেষ পর্যালোচনা ও মূল্যবান তথ্য ও মতামত দিয়েছেন :

- জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, মুজিব রোড, চট্টগ্রাম।
- জনাব মুনির হেলাল, কোডেক, চাঁদগাঁও, চট্টগ্রাম।
- জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম ভূইয়া, দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশ, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম।
- জনাব এএমএম তোহা, ইপসা, চাঁদগাঁও, চট্টগ্রাম।
- জনাবা সৈয়দা ফেরদৌস আক্তার, সমাজসেবা অধিদপ্তর, রৌফাবাদ, চট্টগ্রাম।
- জনাব দেওয়ান কাফরুল হাসান, বন বিভাগ, নন্দন কানন, চট্টগ্রাম।

সূচীপত্র

মুখবন্ধ
জেলা মানচিত্র

সূচনা **১**
এক নজরে চট্টগ্রাম ২
জেলার অবস্থান ৩
উপজেলা তথ্য সারনী ৪

প্রকৃতি ও পরিবেশ **৭**
প্রাকৃতিক পরিবেশ ৭
খনিজ সম্পদ ১০
কৃষি সম্পদ ১০
দুর্যোগ ১১
বিপদাপন্নতা ১৩

জীবন ও জীবিকা **১৫**
জনসংখ্যা ১৫
জনস্বাস্থ্য ১৫
শিক্ষা ১৬
অভিবাসন ১৭
সামাজিক উন্নয়ন ১৭
অর্থনৈতিক অবস্থা ১৭
প্রধান জীবিকা দল ১৭
দারিদ্র ১৮

নারীদের অবস্থান **১৯**

অবকাঠামো **২১**
রাস্তা-ঘাট ২১
পোল্ডার ২১
ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ২১
সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ২১
গবেষণা প্রতিষ্ঠান ২১
অর্থনৈতিক অবকাঠামো ২১
শিল্প ও বাণিজ্য অবকাঠামো ২২
কৃষি অবকাঠামো ২৩
উন্নয়ন প্রকল্প ২৩

সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা **২৫**
পরিবেশগত সমস্যা ২৫
শিল্প উন্নয়নের সমস্যা ২৭
অবকাঠামোগত সমস্যা ২৮
আর্থ-সামাজিক সমস্যা ২৯

সম্ভাবনা ও সুযোগ **৩১**
শিল্প উন্নয়ন ৩১
আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ৩২
প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার ও সংরক্ষণ ৩২
কৃষি সম্পদ উন্নয়ন ৩৩
অবকাঠামোগত উন্নয়ন ৩৪

ভবিষ্যতের রূপরেখা **৩৫**

দর্শনীয় স্থান **৩৭**

জেলা মানচিত্র

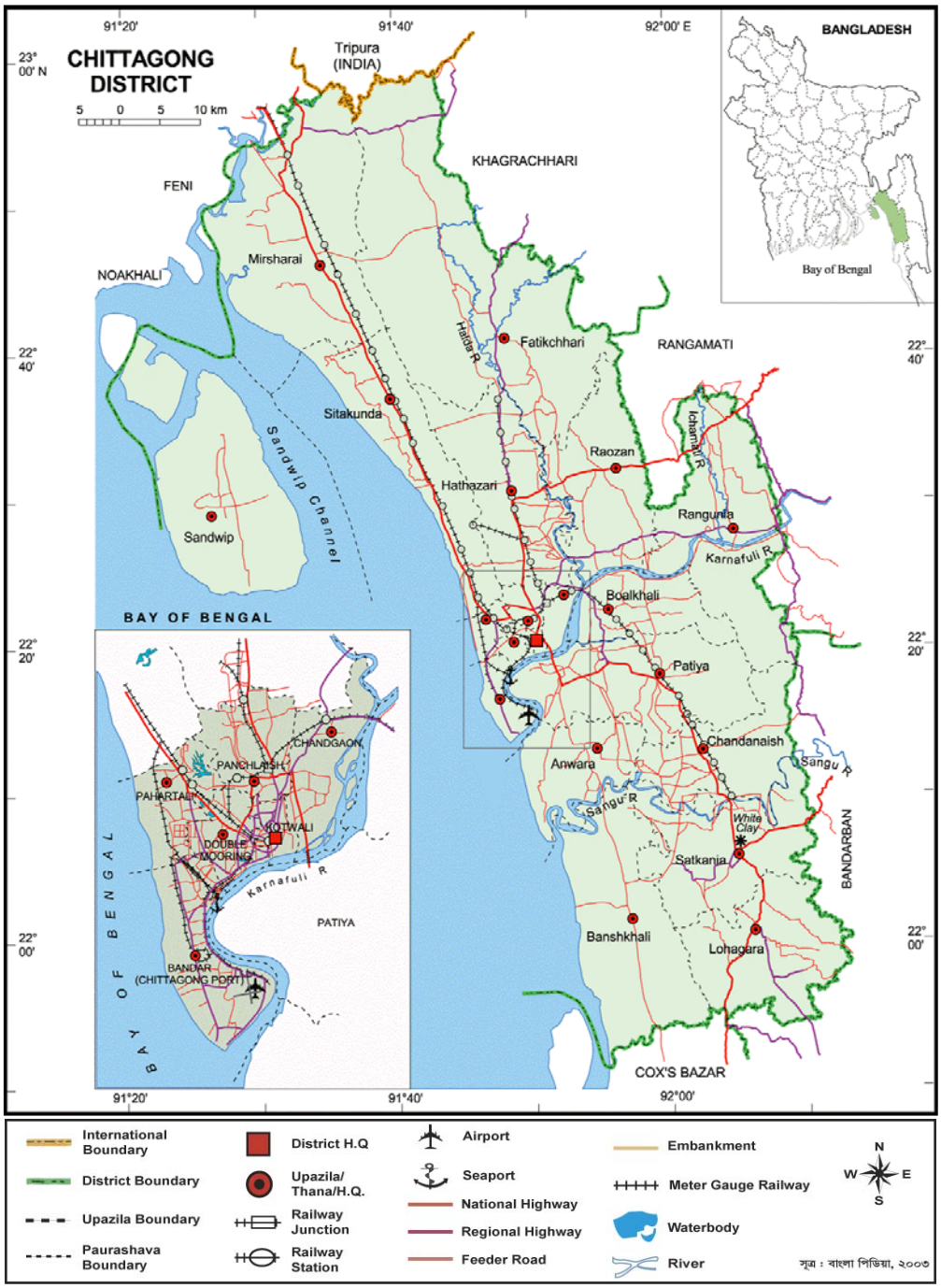
CHITTAGONG DISTRICT
5 0 5 10 km
BANGLADESH
Bay of Bengal
Tripura (INDIA)
KHAGRACHHARI
FENI
NOAKHALI
Mirsharai
Fatikchhari
RANGAMATI
Sitakunda
Raozan
Hathazari
Rangunia
Sandwip
Sandwip Channel
Halda R
Ichamati R
Karnafuli R
BAY OF BENGAL
Boalkhali
Patiya
CHANDGAON
PANCHLAISH
PAHARTALI
KOTWALI
DOUBLE MOORING
BANDAR (CHITTAGONG PORT)
PATIYA
Chandanaish
Anwara
Sangu R
Sangu
White Clay
Satkania
BANDARBAN
Banshkhali
Lohagara
COX'S BAZAR
91°20'
91°40'
92°00' E
92°00'
23° 00' N
22° 40'
22° 20'
22° 00'
International Boundary
District Boundary
Upazila Boundary
Paurashava Boundary
District H.Q
Upazila/ Thana/H.Q.
Railway Junction
Railway Station
Airport
Seaport
National Highway
Regional Highway
Feeder Road
Embankment
Meter Gauge Railway
Waterbody
River
N
W
E
S
সূত্র : বাংলা পিডিয়া, ২০০৩

সূচনা

বন্দর নগরী চট্টগ্রাম প্রাচীন কাল থেকেই বাংলাদেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। অনন্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এই জেলা চট্টগ্রাম বিভাগে অবস্থিত। এই জেলার উত্তরে ফেনী জেলা ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, দক্ষিণে কক্সবাজার জেলা, পূর্বে বান্দরবন, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা এবং পশ্চিমে নোয়াখালী জেলা ও বঙ্গোপসাগর অবস্থিত।

চট্টগ্রামে সভ্যতার গোড়াপত্তন ঘটে অত্যন্ত প্রাচীনকালে। চট্টগ্রাম বন্দর বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত ছিলো প্রাচীনকাল থেকেই। নবম শতাব্দীতে আরব বণিকদের ব্যবসার কেন্দ্রস্থল ছিলো এই বন্দর। এই সময় এই এলাকা "দ্বার-ই-বঙ্গ" বা বঙ্গের দরজা নামে পরিচিত ছিলো। ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে মুসলমানরা আসার আগ পর্যন্ত চট্টগ্রাম অঞ্চল আরাকান অথবা বার্মা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। ১৩৪০ সালে সোনার গাঁওয়ের সুলতান ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ চট্টগ্রাম অঞ্চল দখল করে। পরবর্তীতে ১৫৩৮ সালে আরাকানিরা আবার এই অঞ্চল দখল করে। এই সময় থেকে মোঘলদের অভিযানের আগ পর্যন্ত এই এলাকা পর্তুগীজ ও মগদের দখলে ছিলো। ১৬৬৬ সালে মোঘলরা পুর্তগীজদের বিতাড়িত করে এই এলাকা দখল করে। তারা চট্টগ্রামের নতুন নামকরণ করে ইসলামাবাদ। বিভিন্ন সময় চট্টগ্রাম অঞ্চল বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিলো, যেমন - আদর্শদেশ, সুহ্মদেশ, কীং বা কালেন, রম্যভূমি, চিতাগাঁও, চিৎগাঁও, চট্টল, চৈত্যগ্রাম, সপ্তগ্রাম, চট্টলা, চট্টগ্রাম, চক্রশালা, চন্দ্রনাথ, চরতল, চিতাগঞ্জ, চাটীগাঁ, শ্রীচট্টল, সাতগাঁও, সীতাগঙ্গা (সীতাগাঙ্গ), সতের কাউন, পুষ্পপুর, রামেশ, কর্ণবুল, সহরেসবুজ, পার্ব্বতী, খোর্দ্দ-আবাদ, Portogrando (বৃহৎ বন্দর), ফতেয়াবাদ, আনক, রোশাং, ইসলামাবাদ, মগরাজ্য এবং Chittagong।

তিনটি পাহাড়ি জেলাসহ চট্টগ্রাম জেলা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৬৬ সালে। ১৮৬০ সালে পাহাড়ি জেলাগুলোকে পৃথক করে প্রতিষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম হিল ট্রাক্টস। পরবর্তীকালে ১৯৮৪ সালে কক্সবাজারকে আলাদা জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এই জেলার মোট আয়তন ৫,২৮৩ বর্গ কি. মি., যা সমগ্র বাংলাদেশের আয়তনের ৩.৫৮%। জেলার মোট লোক সংখ্যা ৬৫.৪৪ লাখ। আয়তনের এবং জনসংখ্যা উভয়ের দিক দিয়ে উপকূলীয় জেলাগুলোর মধ্যে এই জেলার অবস্থান ১ম।

২৬টি উপজেলা/থানা, ৬টি পৌরসভা, ৩০৮টি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড, ১২৯৯টি মৌজা/মহল্লা ও ১৩২৯টি গ্রাম নিয়ে চট্টগ্রাম জেলা গঠিত। আনোয়ারা, বায়েজিদ বোস্তামী, বাঁশখালী, বাকলিয়া, বোয়ালখালী, চন্দনাইশ, চাঁদগাঁও, চিটাগাং পোর্ট, ডাবল মুরিং, ফটিক ছড়ি, হালি শহর, হাট হাজারি, কর্নফুলি, কোতোয়ালী, খুলশি, লোহাগড়া, মীর সরাই, পাহাড় তলী, পাঁচলাইশ, পটিয়া, পতেঙ্গা, রাঙ্গুনিয়া, রাউজান, সন্দ্বীপ, সাতকানিয়া, সীতাকুন্ড জেলার ২৬টি উপজেলা/থানা।

উপজেলা	**২৬টি**
পৌরসভা	**৬টি**
ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড	**৩০৮টি**
মৌজা/মহল্লা	**১,২৯৯টি**
গ্রাম	**১,৩২৯টি**

উপজেলা/থানাগুলোর মধ্যে ফটিক ছড়ি আয়তনে সবচেয়ে বড় এবং এখানে সবচেয়ে বেশি লোক বাস করে। এদের মধ্যে সন্দ্বীপ একটি দ্বীপ উপজেলা। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমিভিত্তিক সীমা নির্ধারণের জন্য তিনটি সূচক বিবেচনা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে : জোয়ার-ভাটার প্রভাব, নোনা পানির অনুপ্রবেশ এবং ঘূর্নিঝড় / জলোচ্ছ্বাস। এর ভিত্তিতে চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা, বায়েজিদ বোস্তামী, বাঁশখালী, চিটাগাং পোর্ট, ডাবল মুরিং, হালি শহর, কোতোয়ালী, মীর সরাই, পাহাড় তলী, পাঁচলাইশ, পতেঙ্গা, সন্দ্বীপ, সীতাকুন্ড তীরবর্তী (Exposed Coast) উপকূলীয় এলাকা ।

এক নজরে চট্টগ্রাম

	বিষয়	একক	চট্টগ্রাম	উপকূলীয় অঞ্চল	বাংলাদেশ	তথ্য সূত্র ও বছর
এলাকা/প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	৫,২৮৩	৪৭,২০১	১,৪৭,৫৭০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	উপজেলা	সংখ্যা	২৬	১৪৭	৫০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ইউনিয়ন	সংখ্যা	১৯৭	১,৩৫১	৪,৪৮৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পৌরসভা	সংখ্যা	৬	৭০	২২৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ওয়ার্ড	সংখ্যা	১১১	৭৪৩	২,৪০৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	১,২৯৯	১৪,৬৩৬	৬৭,০৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গ্রাম	সংখ্যা	১,৩২৯	১৭,৬১৮	৮৭,৯২৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	৬৫.৪৪	৩৫০.৭৮	১২৩৮.৫১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	লাখ	৩৪.৪০	১৭৯.৪২	৬৩৮.৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	লাখ	৩১.০৩	১৭১.৩৫	৫৯৯.৫৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	বর্গ কি.মি.	১,২৩৯	৭৪৩	৮৩৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	লিঙ্গ অনুপাত	অনুপাত	১০০:১১১	১০০:১০৫	১০০:১০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির আকার	গৃহ প্রতি জনসংখ্যা	৫.৩	৫.১	৪.৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির মোট সংখ্যা	লাখ	১২.২৯	৬৮.৪৯	২৫৩.০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী প্রধান গৃহ	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	৪	৩.৪৪	৩.৫০	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
ভৌত অবকাঠামো	টেকসই দেয়ালসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৫২	৪৭	৪২	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৪৯	৫০	৫৪	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৫৬	৩১	৩১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	প্রাথমিক স্কুল	সংখ্যা / ১০,০০০ জন	৪.২	৭	৬	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	রাস্তার ঘনত্ব	কি.মি./বর্গ কি.মি.	০.৮৩	০.৭৬	০.৭২	বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬ ও বি.বি.এস.,২০০৩
	বাজারের ঘনত্ব	বর্গ কি.মি. / সংখ্যা	৭৩	৮০	৭০	১৯৯৬ (বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬)
অর্থনীতি	মোট আয়	কোটি টাকা	১,৮৬২	৬৭,৮৮০	২,৩৭,০৭৪	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	মাথাপিছু আয়	টাকা	২৮,১১৩	১৮,১৯৮	১৮,২৬৯	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মক্ষম শ্রম শক্তি (১৫ বছর+)	হাজার	৩,০৩৭	১৭,৪১৮	৫৩,৫১৪	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মরত নারী (খাদ্য বা অর্থের বিনিময়ে)	% (১৫-৪৯ বয়সদল)	২৫	২৬	২৮	২০০১ (নির্পোট, ২০০৩)
	কৃষি শ্রমিক	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	২২	৩৩	৩৬	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	জেলে	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	৭	১৪	৮	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ	হেক্টর	০.০২	০.০৬	০.০৭	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	দারিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	৫০	৫২	৪৯	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
	অতি দারিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	২৬	২৪	২৩	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
শিক্ষা	প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু(%)	৯৪	৯৫	৯৭	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	সাক্ষরতার হার, ৭ বছর+	মোট জনসংখ্যা (%)	৫৫	৫১	৪৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৫৯	৫৪	৫০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৫০	৪৭	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	সাক্ষরতার হার, ১৫ বছর+	মোট জনসংখ্যা (%)	৫৯	৫৭	৪৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৬৬	৬১	৫৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৫২	৪৯	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
স্বাস্থ্য	গ্রামীণ পানি সরবরাহ (সক্রিয় টিউবওয়েল)	প্রতি গড় জনসংখ্যা	১৫৫	১১১	১১৫	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই, ২০০৩)
	কল অথবা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৯৩	৮৮	৯১	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৫৭	৪৬	৩৭	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	হাসপাতালের শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা (সরকারি)	জন / শয্যা	৩,৯০৮	৪,৬৩৭	৪,২৭৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নবজাতক মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৬০	৫১-৬৮	৪৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	<৫ বছর শিশু মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	১০৩	৮০-১০৩	৯০	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	অতি অপুষ্টির হার	%	৫	৬	৬	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	ছেলে	%	৪	৪	৪	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মেয়ে	%	৫	৮	৬	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মাতৃ মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৫	৫	৫	১৯৯৮/৯৯ (স্বাস্থসেবা অধিদপ্তর, ২০০০)
	আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি গ্রহণকারী নারী	%	৩৮	৪১	৪৪	২০০১ (নির্পোট, ২০০৩)

জেলার অবস্থান

জাতীয় অবস্থার তুলনায় ভাল দিক

- চট্টগ্রাম জেলার মাথাপিছু আয় (২৮,১১৩ টাকা) জাতীয় (১৮,২৬৯ টাকা) ও উপকূলীয় অঞ্চলের গড় আয়ের (১৮,১৯৮ টাকা) তুলনায় অনেক বেশি ।
- জেলার বার্ষিক আয় প্রবৃদ্ধির হার (৫.৫%) জাতীয় ও উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (৫.৪%) চেয়ে বেশি।
- জেলার মোট আয়ে শিল্পখাতের অবদান ৩৬%, যা জাতীয় (২৫%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২২%) হারের তুলনায় অনেক বেশি।
- রাস্তার ঘনত্ব (০.৮৩ কি. মি./ বর্গ কি. মি.), জাতীয় (০.৭২ কি. মি./বর্গ কি. মি.) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (০.৭৬ কি. মি./ বর্গ কি. মি.) চেয়ে বেশি।
- সাক্ষরতার হার (৭^{+} বছর) ৫৫%, যা উপকূলীয় অঞ্চলের (৫১%) ও জাতীয় হারের (৪৫%) তুলনায় অনেক বেশি।
- জেলার ৫৭% গৃহে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধা আছে, যা জাতীয় হারের (৩৭%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (৪৬%) তুলনায় অনেক বেশি।
- জেলার মোট গৃহের ৯৩% কল বা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত, যা জাতীয় (৯১%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৮৮%) হারের তুলনায় বেশি।
- জেলায় ৫৬% গৃহে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে, যা জাতীয় (৩১%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৩১%) তুলনায় অনেক বেশি।
- ক্ষুদ্র কৃষকদের সংখ্যা (৪৫%) জাতীয় (৫৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫৮%) তুলনায় কম।
- হাসপাতালে শয্যা প্রতি জনসংখ্যা ৩,৯০৮ জন, যা জাতীয় (৪,২৭৬ জন) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪,৬৩৭ জন) তুলনায় কম।
- জেলার গড়ে প্রতি ৭৩ বর্গ কি. মি. এলাকাতে একটি হাট-বাজার কেন্দ্র রয়েছে, যা জাতীয় (৭০ বর্গ কি. মি. এ একটি) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৮০ বর্গ কি. মি. এ একটি) তুলনায় কম।
- মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫ জন, যা জাতীয় (৫ জন) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫ জন) সমান।
- জেলায় শহুরে জনসংখ্যার ভাগ (৫০%) জাতীয় ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২৩%) তুলনায় অনেক বেশি।
- নিম্ন মাত্রার লিঙ্গীয় অসমতা।
- পর্যটনের দিক থেকে আকর্ষণীয়।

জাতীয় অবস্থার তুলনায় দুর্বল দিক

- জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে ৫৫) সমস্ত উপকূলীয় জেলাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম, কিন্তু জাতীয় (৪৩) হারের তুলনায় অনেক বেশি।
- জেলার দরিদ্র ও অতি দরিদ্র গৃহস্থালির সংখ্যা (৫০%, ২৬%) জাতীয় হারের (৪৯%, ২৩%) তুলনায় অনেক বেশি এবং সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের (৫২%, ২৪%) প্রায় সমান।
- জেলায় ১৩-৪৯ বয়স দলের নারীদের মধ্যে আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৩৮%, যা জাতীয় (৪৪%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪১%) হারের তুলনায় কম।
- জেলার ভূমিহীনদের সংখ্যা (৬৪%), জাতীয় (৫৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫৪%) হারের তুলনায় বেশি।
- জেলার মোট আয়তনের ১১% প্রত্যন্ত এলাকা বা দ্বীপাঞ্চল।

উপজেলা তথ্য সারনী

বিষয়		একক	চট্টগ্রাম	উপজেলা									
				আনোয়ারা	বায়েজিদ বোস্তামী	বাঁশখালী	বাকালিয়া	বোয়ালখালী	চন্দনাইশ	চাঁদগাঁও	চিটাগাং পোর্ট	ডাবল মুরিং	ফটিক ছড়ি
এলাকা/ প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	৫,২৮৩	১৬৪	১৮	৩৭৭	১২	১২৬	২০২	২৫	২০	৮	৭৭৪
	ইউনিয়ন / ওয়ার্ড	সংখ্যা	৩০৮	১০	৪	১৫	৪	১০	১০	৩	৫	৭	২০
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	১,২৯৯	৭৫	১২	৭২	৯	৩৫	৪৪	১১	১১	৪২	১০২
	গ্রাম	সংখ্যা	১,৩২৯	৭৫	-	১১৪	-	৩১	৫৬	-	-	-	২০৬
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	৬৫.৪৪	২.২৩	১.৬৭	৩.৮৮	১.৯৬	১.৯২	১.৮৮	১.৭৮	২.০৫	২.৫৫	৪.৪০
	পুরুষ	লাখ	৩৪.৪০	১.১২	০.৯৩	২.০৩	১.০৭	১.০২	০.৯৮	০.৯৫	১.১১	১.৪৩	২.২০
	নারী	লাখ	৩১.০৩	১.১১	০.৭৩	১.৮৫	০.৮৯	০.৯০	০.৮৯	০.৮৩	০.৯৩	১.১১	২.১৯
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	জন/বর্গ কি.মি.	১,২৩৯	১,৩৬০	৯,৫০৬	১,০৩১	১৫,৯৭১	১,৫২৬	৯৩৪	৭,০৩২	১০,২৪৬	৩১,৪০৯	৫৬৯
	নারী পুরুষের অনুপাত	অনুপাত	১১১	১০১	১২৬	১১০	১২০	১১৪	১১০	১১৪	১১৯	১২৯	১০০
	গৃহস্থালির মোট সংখ্যা	লাখ	১২.২৯	০.৩৯	০.৩৪	০.৬৮	০.৪১	০.৩৬	০.৩৫	০.৩৩	০.৪১	০.৫৩	০.৭৭
	গৃহস্থালির আকার	জন/গৃহস্থালি	৫.৩	৫.৬১	৪.৭৮	৫.৬৪	৪.৭০	৫.৩২	৫.৩০	৫.২৪	৪.৯৪	৪.৭৪	৫.৬৯
	নারী প্রধান গৃহ	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের %	৪	৩.৭	-	২.৬	-	৩.১	৩.২	-	১.৪	-	৪.৪
ভৌত অবকাঠামো	টেকসই দেয়ালসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৫২	৬৬	-	৭৭	-	৪৯	৫৬	৪৫	৫৩	৫২	৪৮
	টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৪৯	৩২	-	২১	–	৫৩	৪১	৬০	৭৫	৬৩	৩৮
	বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৩৭	১০	-	৩	-	১৬	১৩	৮১	৮৮	৯৬	২৩
	প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	২,৭৮১	১২১	-	১৬৭	-	১১৪	১১৯	৮৫	৬৫	৬২	২৩৮
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	৫৬৯	২৩	-	২৫	-	২৮	২৪	১৭	১৬	৩১	৪৯
	মহাবিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	১০৫	৩	-	৩	-	৪	৪	৩	৬	৭	৫
অর্থনীতি	কৃষি শ্রমিক	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের %	২২	২৬	-	৩৪	-	১৪	১৯	-	৫	-	২২
	কৃষি প্রধান পরিবার	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের %	৫২	৫৯	-	৬১	-	৪৭	৪৭	-	১৯	-	৫১
	অকৃষি প্রধান পরিবার	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের %	৪৮	৪১	-	৩৯	-	৫৩	৫৩	-	৮১	-	৪৯
	মোট চাষের জমি	হেক্টর	১৩৭,৪২২	৭৮২৬	-	১২,৪৪৬	-	৫,১০৬	৬,৬৬৩	-	২৫৫	-	২০,৬৬০
	এক ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	২৯	৩৬	-	৩৩	-	-	৪০	-	-	-	৫৮
	দো ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	৫৪	৩৪	-	৩৭	-	-	৪৩	-	-	-	৩০
	তিন ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	১৭	৩০	-	৩০	-	-	১৭	-	-	-	১২
	প্রতি ০.০১ হেক্টর জমির মূল্য	টাকা	১৭,০০০	২৫,০০০	-	৯,৫০০	-	১২,৫০০	১২,৫০০	-	-	-	-
শিক্ষা	সাক্ষরতার হার (৭ বছর$^+$)	%	৫৫	৪৭	৫৫	২৮	৫০	৭২	৫৮	৬৫	৭১	৬৪	৪২
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু (%)	৯৪	৮৯	-	৬২	-	১০২	১০৩	৯১	৯৫	৮৭	৯৬
	মেয়ে	৬-১০ বছর শিশু (%)	৯৭	৮৯	-	৬১	-	১০৩	১০৪	৮৮	৯৩	৯৫	১২৭
স্বাস্থ্য	সক্রিয় টিউবওয়েল	সংখ্যা	৪২,৩০৬	২,১০৪	–	২,৪৮৩	–	২,৬৪৬	১,৬৮৮	-	-	-	৪,১৫০
	কল অথবা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৮৩	৭৯	-	৯১	-	৭৭	৮২	৮৬	৯৩	৯৭	৮৬
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	২৩	১৩	-	৬	-	১৫	১১	৪২	৫০	৫৯	১২

উপজেলা																
হালি শহর	হাট হাজারী	কর্ণফুলী	কোতোয়ালী	খুলশি	লোহাগড়া	মীর সরাই	পাহাড় তলী	পাঁচলাইশ	পটিয়া	পতেঙ্গা	রাঙ্গুনিয়া	রাউজান	সন্দ্বীপ	সাতকানিয়া	সীতাকুন্ড	তথ্য সূত্র ও বছর
১০	২৪৬	১৩৭	৮	১৩	২৫৯	৪৮৩	১৩	৮	২১২	৩৩	৩৬২	২৪৭	৭৬২	২৮১	৪৮৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৩	১৫	৮	১০	৪	৯	২৫	৩	৫	২৬	৩	২১	২৩	২৯	১৭	১৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
২৭	৪৪	২৭	২৩	৪৫	৪০	১২৬	১৪	১৩	১২২	৩	৮৯	৮৫	৭২	৭৩	৮৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
-	৫৯	২৭	-	-	৪৩	২১১	-	-	১১৩	-	১১৩	৬৫	৩৪	১০২	৬০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১.২৪	৩.৯৬	১.৭৮	২.৭৪	২.৪০	২.৬৬	৩.৫৬	১.১৮	১.৪৭	৩.২০	০.৮৫	২.৯৮	৩.৩১	২.৯২	৩.৩৮	৩.৩৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
০.৬৬	২.০২	০.৯৭	১.৬২	১.৩২	১.৩২	১.৮০	০.৬৪	০.৮২	১.৬৫	০.৪৯	১.৫২	১.৭১	১.৪৬	১.৬৫	১.৭৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
০.৫৮	১.৯৪	০.৮১	১.১২	১.০৭	১.৩৪	১.৭৫	০.৫৩	০.৬৫	১.৫৫	০.৩৫	১.৪৬	১.৫৯	১.৪৬	১.৭২	১.৫৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১২,৯৪৪	১,৬০৯	১,৩১০	৩৫,৮০৫	১৮,৩৪৫	১,০৩০	৭৩৮	৮,৯১৫	১৭,৭৮১	১,৫১৫	২,৬১৬	৮২৬	১,৩৪৫	৩৮৪	১,২০৫	৬৯৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১১৪	১০৪	১১৯	১৪৪	১২৩	৯৯	১০৩	১২০	১২৭	১০৬	১৪১	১০৪	১০৭	১০০	৯৬	১১৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
০.২৩	০.৬৬	০.৩৩	০.৫৭	০.৫০	০.৪৫	০.৬৯	০.২৪	০.৩৪	০.৬১	০.১৪	০.৫৪	০.৫৭	০.৫০	০.৫৯	০.৬৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৫.২৮	৫.৯৭	৫.৪০	৪.৮১	৪.৭৭	৫.৮৪	৫.১৫	৪.৯১	৪.২৭	৫.২২	৬.০৬	৫.৫৩	৫.৭৮	৫.৭৬	৫.৭৩	৫.২৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
-	-	-	-	-	৪.৪	৫.৫	-	-	৪.৩	-	৪.৪	৩.৮	৪.৭	২.৮	-	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
-	৪৭	-	৬৮	-	৮১	২১	৫৪	৫৮	৫৭	-	৫৮	৪৯	২৫	৫৭	-	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
-	৫৯	-	৮২	-	৩২	৫৩	৫৯	৫৭	৪১	-	-	-	-	-	-	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
-	৪২	-	-	-	১০	৭	৮৫	৮৬	৩৭	-	১৫	১৭	৩	১৫	৫৫	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
-	১৯৩	-	৬৩	-	১২৩	২৪৫	৫৮	৭১	২২২	-	১৬৩	২০৯	১৫৮	১৯৫	১১০	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
-	৪৪	-	৩৪	-	১৯	৩৮	১৩	১৪	৪৫	-	৩৪	৫০	২৬	৩৪	২৯	২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)
-	৬	-	৮	-	৩	৪	৪	৫	১০	-	৯	৯	৩	৫	৪	২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)
-	-	-	-	-	২৪	২২	-	-	১৭	-	২২	১২	২৫	২০	-	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
-	-	-	-	-	৫৬	৫১	-	-	৫১	-	৪৭	৪৪	৬৪	৪৬	-	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
-	-	-	-	-	৪৪	৪৯	-	-	৪৯	-	৫৩	৫৬	৩৬	৫৪	-	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
-	-	-	-	-	৯,২৯৯	১৫,৯২৯	-	-	৯,০২২	-	১৩,২৩২	১০,৭৬৭	১৪,৬৯১	১১,৫২৩	-	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
-	৪	-	-	-	৩২	৩৯	-	-	১১	-	-	১৫	৩৫	১৮	২৫	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
-	৮২	-	-	-	৫১	৪২	-	-	৭০	-	-	৭৬	৪৫	৬০	৫৮	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
-	১৫	-	-	-	১৬	১৯	-	-	১৯	-	-	৯	২০	২২	১৭	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
-	১২,৫০০	-	-	-	৪,০০০	৬,৫০০	৩০০,০০০	-	১০,০০০	-	১২,৫০০	১২,৫০০	৭,৫০০	৯,০০০	১৫,০০০	২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩)
৬৪	৫৭	৪৪	৭৯	৫৭	৪৫	৫২	৭০	৬৬	৫৮	৬০	৫৩	৬৫	৪৭	৪৫	৫৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
-	৯৫	-	১২১	-	১০০	৯৪	১২৩	১০০	৯৭	-	৯৯	৯৫	১০০	৯০	১০০	২০০১(প্রা.শি.অ)
-	৯২	-	১২৪	-	১০১	৯৬	১২১	১০৪	৯৭	-	১০১	১০০	১০২	৯৪	১০০	২০০১(প্রা.শি.অ)
-	৩,৭৭৮	-	-	-	২,২২২	৩,৭৩৭			৩,৬৬৬	-	৩,৩২৩	৩,১৯৩	৩,২৮৭	৩,৬৭৯	২,৩৫০	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই, ২০০৩)
-	৭৮	-	৯৯	-	৯১	৭৩	৯১	৯৪	৬৫	-	৮৮	৭৮	৬৫	৯৫	৬৯	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
-	২২	-	৭২	-	১১	১১	৪৬	৫৫	১১	-	১২	১৮	১২	১৩	১৬	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)

প্রকৃতি ও পরিবেশ

একদিকে সাগর ও নদীর প্রভাব, পাহাড়, নতুন জমি, দ্বীপ, বনাঞ্চল এবং অন্যদিকে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প - এই সবই চট্টগ্রাম জেলার প্রকৃতি ও পরিবেশকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। সাগর ও নদীর প্রভাব যেমন অত্যন্ত বেশি তেমনি পাহাড়ের অবস্থানও জেলার পরিবেশকে প্রভাবিত করে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

জলবায়ুঃ জেলার জলবায়ু সমভাবাপন্ন। মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বাতাসে উচ্চ তাপমাত্রা দেখা যায়। জেলার তাপমাত্রা সাধারণত ১৪° সে. থেকে ৩৪° সে. এর মধ্যে থাকে। সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৫% এবং ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আপেক্ষিক আর্দ্রতা গড়ে ৭২% থাকে। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় তিন হাজার মিলিমিটার। এই জেলার দ্বীপগুলো ও সাগরের কাছাকাছি এলাকাগুলো প্রায়ই সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হয়।

জলবায়ু	**সমভাবাপন্ন**
তাপমাত্রা	**১৪° সে. - ৩৪° সে.**
আপেক্ষিক আর্দ্রতা	**৭২% - ৮৫%**
বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত	**প্রায় ৩,০০০ মি. মি.**

নদী ও মোহনা : এই জেলার প্রধান নদীগুলো হচ্ছে- কর্ণফুলী, হালদা, ফেনী, মুহুরী এবং সাঙ্গু। এই নদীগুলোতে সারা বছরই পানি থাকে এবং নৌযান চলাচলের উপযুক্ত থাকে। এই নদীগুলোর সাথে অনেক খাল ও খাঁড়ি রয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - কাপ্তাই, কুমারখালি, মহেশখাল, হিঙ্গুলি খাল, কাটাখালি, চাঁদখালি, আনওয়ারি, সালদা, দুরখাল, সিলোখাল ইত্যাদি। সব মিলিয়ে নদ-নদীগুলো প্রায় ৫৬২ বর্গ কি. মি. এলাকাতে বিস্তৃত, যা সমগ্র জেলার প্রায় ১১%। প্রধান নদীগুলোর বর্ণনা নিচে দেয়া হল।

হালদা নদী : পার্বত্য চট্টগ্রামে বদনা তলী রেঞ্জ থেকে উৎপন্ন হয়ে হালদা নদী ফটিকছড়ি উপজেলায় চট্টগ্রাম জেলায় প্রবেশ করেছে। তারপর এটি বিবিরহাট, নাজিরহাট, সাত্তারঘাট, ফটিকছড়ি, হাটহাজারী, রাউজান, কোতোয়ালীর উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বালুর ঘাটের নিকটে কর্ণফুলীর সাথে মিলিত হয়েছে। এই নদীটির মোট দৈর্ঘ্য ৮১ কিলোমিটার, যার মধ্যে নাজিরঘাট পর্যন্ত ২৯ কিলোমিটার জুড়ে সারা বছরই বড় বড় নৌকা চলাচল করতে পারে। নারায়ণহাট পর্যন্ত ১৬ থেকে ২৪ কিলোমিটার পর্যন্ত ছোট খাটো নৌকা চলাচল করতে পারে।

ধুরং, হালদার একটি খরস্রোতা শাখা নদী, পার্বত্য চট্টগ্রামের পক্ষিমুরা রেঞ্জের নিকট উৎপন্ন হয়েছে। এটি ফটিকছড়ি উপজেলার প্রায় পুরোটা জুড়ে হালদা নদীর সমান্তরালে প্রবাহিত হয়ে গেছে এবং ৪৮ কি.মি. ভাটিতে পূর্ব ঢালাই নামক স্থানে কর্ণফুলীর সাথে মিলিত হয়েছে।

কর্ণফুলী নদী : কর্ণফুলী চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ নদী। ভারতের মিজোরাম রাজ্যের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে এই নদী রাঙ্গামাটির নিকটে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। নদীটি বেশ কয়েকবার বাঁক বদল করে কাপ্তাই হ্রদে পরে। কাপ্তাই হ্রদ থেকে উৎপন্ন হয়ে সীতাপাহাড় পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চন্দ্রঘোনার কাছে দিয়ে চট্টগ্রাম জেলায় প্রবেশ করেছে। নদীটি বিভিন্ন পর্বতশ্রেণী যেমন - বরকল, বামুরা, চিলারডাক, সিতাপাহাড় ও পটিয়া অতিক্রম করেছে। কর্ণফুলী নদীর প্রধান শাখা নদীগুলো হল - কাসালঙ্গ, চেঙ্গি, হালদা, ধুরং, সুরালঙ্গ, কাপ্তাই, রাইংকিয়ং, থেগা।

সাঙ্গু নদী : পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্তবর্তী আরাকান রাজ্য থেকে উৎপন্ন হয়ে সাঙ্গু নদী বান্দরবন জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চট্টগ্রাম জেলার পূর্বপাশ দিয়ে প্রবেশ করে পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। নদীটির

মোট দৈর্ঘ্য ২৭০ কিলোমিটার এবং এর মধ্যে ১৭৩ কিলোমিটার বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত। সাঙ্গু নদীর প্রধান শাখা নদী হল দোলুকাল, চান্দখালি। আরো ভাটিতে এটি কুমারিখালির সাথে মিলিত হয়েছে এবং কুতুবদিয়া চ্যানেলের সাথে মিশেছে।

ফেনী নদী : ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের পর্বতশ্রেণী থেকে উদ্ভব হয়ে ফেনী নদী ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য এবং বাংলাদেশের ফেনী, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এই নদী চট্টগ্রাম, নোয়াখালী এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উৎস থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত নদীটি ১১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ। বর্ষাকালে নদীর তীব্র স্রোত ও ঘূর্ণি ভয়ংকর রূপ ধারণ করে।

লেক : ১৯২৪ সালে খুলশীর নিকটে ফয়'স লেক তৈরি করা হয়। দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী খাড়িতে বাঁধ দিয়ে এই লেকটি তৈরি করা হয়েছে। ভূ-তাত্ত্বিকভাবে এই পাহাড়গুলো দুপি টিলা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ১৯২০ সালে পাহাড়তলি রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে আরো একটি হ্রদ তৈরি করা হয়।

মাটি : চট্টগ্রাম জেলায় বিভিন্ন ধরনের ভূ-প্রকৃতি দেখা যায়। এর পশ্চিমাঞ্চল বঙ্গোপসাগর দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত। পূর্বে পাহাড় ও ঢাল দেখা যায়। এই জেলার বেশকিছু অংশ হালদা, সাঙ্গু ও কর্ণফুলী নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত হয়েছে। পাহাড়িয়া অঞ্চলের মাটি বালু যুক্ত। অধিকাংশ এলাকাই মাঝারি ধরনের বন্যার শিকার হয়ে থাকে।

সাগর : বঙ্গোপসাগরের পানি অন্যান্য সাগরের তুলনায় অগভীর ও কম লবণাক্ত। বিচিত্র ধরনের জীবের সমাবেশ ঘটে এই পানিতে। উপকূলের অনেক মানুষই এই সম্পদ আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

বনভূমি : জেলার মোট বনভূমির পরিমাণ ১৩৯,২৭৪ হেক্টর (বিবিএস, ২০০১)। চট্টগ্রাম জেলায় প্রধানত চার ধরনের বনভূমি দেখা যায়। এগুলো হল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আর্দ্র চিরহরিৎ, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় চির হরিৎ, পর্ণমোচী ও ম্যানগ্রোভ বন। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আর্দ্র চিরহরিৎ বনের প্রধান বৃক্ষরাজি হল গর্জন, ঢালি গর্জন, সিভিট, ধূপ, চম্পা, নারিকেলি, চুন্দুল, বান্দরহোলা, কামদেব, ঢাকি জাম, পিটরাজ, চালমুগরা, নাগেশ্বর, গামার, চাপালিশ, জারুল, হরিতকি, বহেরা, জলপাই, ডুমুর, বন সোনালু, আম ইত্যাদি।

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় চিরহরিৎ বনের প্রধান বৃক্ষরাজি হল - বৈলাম, তেলশুর, কনক, আশার, বরমালা, কবিতা, শেওড়া, বাটনা, সিদুঁর, তেলি গর্জন, বাইট্টা গর্জন, শিমূল, বন-শিমূল, হরগোজা, তুন, আমলকি, ভাদি, উদল, কুর্চি, বার্তা, চাপালিশ, করই ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশ ও বেত, যেমন - মিতেঙ্গা, মুলি, ডলু, ওরা, বান্দরি, করক, গলক, জাটি ইত্যাদি দেখা যায়। বিভিন্ন প্রকার লতা-পাতা যেমন বনপান, বন পিপুল, কুমারিকা, গিল্লা লতা, কুকি লতা, পাটিপাতা, নল খাগড়া, দলঘাস দেখা যায়। এ ছাড়া বনবিভাগ পাহাড়ি অঞ্চলে মেহগনি, পাইন, আকাশমনি, রাবার প্রভৃতি গাছের সফল বনায়ন করেছে।

চট্টগ্রাম জেলায় উপকূলীয় বনায়ন অনেক আগে থেকে হয়ে আসছে। ১৯৬৭ সাল থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩৯,৩২৮ হেক্টর বাগান সৃজন করা হয়েছে। ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ের পরে প্রাণহানি ও ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ লক্ষ্য করেন যে, যেসব এলাকায় গাছপালার আচ্ছাদন ছিল সেসব এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি অনেক কম হয়েছে। তাই এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনি প্রকল্পের আওতাধীনে জেলার সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে ঝাউ, কেওড়া, বাইন, নারকেল প্রভৃতি গাছের সফল বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনি সৃজন করা হয়। এই বন একদিকে যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে লোকজনকে রক্ষা করে অপরদিকে মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদেরও জোগান দেয়।

দ্বীপাঞ্চল : চট্টগ্রাম জেলায় অনেকগুলো দ্বীপ রয়েছে। সব মিলিয়ে এই জেলার ১১ শতাংশ এলাকা জুড়ে দ্বীপাঞ্চল রয়েছে। সন্দ্বীপ একটি দ্বীপ উপজেলা। উল্লেখযোগ্য দ্বীপ ও দ্বীপ সংলগ্ন চরগুলো হল- ভাসান চর, জাহাজ্জির চর, সন্দ্বীপ, উরির চর, বাঁশখালী। দ্বীপগুলোর প্রায় প্রতিটিতেই মানুষ বাস করে। মাছ ধরা, কৃষি, পশুপালন দ্বীপবাসীদের আয়ের প্রধান উৎস। তবে প্রতিটি দ্বীপই প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা, ভূমিক্ষয়ের শিকার। তীব্র স্রোত ও জোয়ার-ভাটার ফলে অনেক দ্বীপেরই আকার ও আয়তন বদলাচ্ছে। এদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি দ্বীপের বৈশিষ্ট্য পাশের সারণীতে দেখানো হল।

নাম	আয়তন (হেক্টর)	জনসংখ্যা	প্রাকৃতিক সম্পদ	অবকাঠামো
ভাসান চর	৫,০০০	-	ম্যানগ্রোভ বন, মাছের বিচরণ ক্ষেত্র	-
জাহাজ্জির চর	১৮,১০০	-	মাছের বিচরণ ক্ষেত্র	-
সন্দ্বীপ	৭৬,২০০	২.৯৩ লাখ	ম্যানগ্রোভ বন, সামুদ্রিক মাছ, চারণ ভূমি	বাঁধ, সাইক্লোন শেল্টার
উরির চর	৬,৫০০	৯,২৯৫	সামুদ্রিক মাছ, চারণ ভমি	বাঁধ, সাইক্লোন শেল্টার

উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্য : জেলার জলবায়ু ও মাটির ধরন এখানকার উদ্ভিদ ও জীব জগতে বৈচিত্র্য এনেছে। জেলার উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্যের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে দেয়া হলো।

উদ্ভিদ : এখানে প্রায় প্রতিটি বাড়ীতেই প্রচুর পরিমাণ গাছপালা রয়েছে। বাড়ীতে জন্মানো গাছের মধ্যে আম, গাব, জাম, তাল, তেতুল, কাঁঠাল, জলপাই, বেল, চালতা, বরই, পেয়ারা, লিচু, কামরাঙ্গা, আতা, হরিতকী, আমলকি অন্যতম। এ ছাড়া অনেক বাড়ীতেই বাদাম ও কলাগাছ দেখা যায়। স্থানীয় গাছের মধ্যে কড়ই, শীল কড়ই, গর্জন, জারুল, শিমূল অন্যতম। এ ছাড়াও বিভিন্ন জাতের বিদেশী গাছ যেমন টিক, মেহগনি, শিশু রাস্তার পাশে ও বাড়িতে লাগানো হয়। এ ছাড়া প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই মান্দার নামের এক প্রকার কাঁটাওয়ালা গাছ বেড়া ও জ্বালানির জন্য লাগানো হয়। বর্তমানে ইউক্যালিপটাস ও পাইন গাছও লাগানো হচ্ছে। নারিকেল ও সুপারি গাছ সারা জেলাতেই জন্মে। এই জেলায় বিভিন্ন জাতের বেত, বাঁশ ও ছন জন্মে। জলা এলাকায় সোলা ও শীতল পাটি দেখা যায় যা বিভিন্ন প্রকার মাদুর ও ঝুড়ি তৈরীতে ব্যবহৃত হয়।

চট্টগ্রামের বন বিভাগের অধীনস্থ সীতাকুণ্ডের নিকটে বাড়িয়াবালা রেঞ্জে ৪০৫ হেক্টর জুড়ে একটি ইকোপার্ক স্থাপন করা হয়েছে। এখানে একটি ইকোপার্ক ও বন বিভাগ পরিচালিত এই ইকোপার্কের প্রধান আকর্ষণ হল চন্দ্রনাথ পাহাড়ের উপর অবস্থিত চন্দ্রনাথ মন্দির, সহস্রধারা ও সুপ্তধারা নামের দুটি ঝর্ণা, বিচিত্র ধরনের গাছ, লতা-পাতা, বন্যপ্রাণী ইত্যাদি। পরবর্তীতে ৪০৩ হেক্টর জুড়ে একটি বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপন করা হবে।

প্রাণী : চট্টগ্রাম জেলার বনভূমিতে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী দেখা যায়, যেমন চিতা বিড়াল, মেছি বিড়াল, সোনালি বিড়াল, বন বিড়াল, বানর, মুখপোড়া বানর, লেঙ্গুর, খাটোলেজি বানর, বার্কিং ডিয়ার, বুনো শুয়োর, খেকশিয়াল, পাতি শিয়াল, শিয়াল, বাগডাসা, উদবিড়াল, কাঠবিড়ালি, বেজী, বিভিন্ন প্রকার ইঁদুর, বাঁদুড়, শজারু ইত্যাদি। তবে

অনুকূল পরিবেশ ও প্রাকৃতিক বনের অভাবে অনেক বন্যপ্রাণীই এখন বিলুপ্ত প্রায়। এই জেলায় চিতাবাঘ, সম্বর, গয়াল, বন ছাগল, হাতি আর দেখতে পাওয়া যায় না বললেই চলে।

সারা দেশের মতো এখানেও অনেক ধরনের পাখী দেখা যায়; যাদের মধ্যে শকুন, বাজ, গাংচিল, চিল, কানি বগা, গো বগা, কালা বগা, কাক, মাছরাঙ্গা অন্যতম। বিভিন্ন প্রজাতির হাঁস আছে। এছাড়াও জলচর পাখী যেমন পানকৌড়ি, ডাহুক, কোরা, পিটালী, রাজহাঁস অন্যতম। এদের পাশাপাশি এই জেলায় দোয়েল, কোকিল, হলদি পাখী, ফিঙ্গে, ময়না, শালিক, বুলবুল, টুনটুনি, শ্যামা, বাবুই, কবুতর ও ঘুঘু দেখা যায়। শীতকালে এই জেলায় প্রচুর অতিথি পাখী আসে।

চট্টগ্রাম জেলার চুনতিতে একটি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য আছে। এটি ১৯৮৬ সালে স্থাপিত হয়েছিলো এবং বর্তমান আয়তন প্রায় ৭,৭৬১ হেক্টর। অবৈধভাবে গাছ-পালা কাটা, গাছ চুরি, কৃষি কাজ, পশু চারণ, অবৈধভাবে বন্যপ্রাণী শিকার এই অভয়ারণ্যের প্রধান সমস্যা।

সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছ : বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছও এই জেলায় পাওয়া যায়। জনপ্রিয় মাছগুলো হচ্ছে রুই, কাতল, মৃগেল, কালবাউশ, আইড়, টেংরা, মাগুর, শিং, শোল, বোয়াল, গজাড়, পাবদা, কই, মুড়লা, পুটি, বাইন এবং চেলা। এদের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার কার্প জাতীয় মাছ, তেলাপিয়া, নাইলোটিকা পুকুর ও দীঘিতে চাষ করা হয়।

সাগরে রয়েছে অফুরন্ত জীববৈচিত্র্য। বঙ্গোপসাগরে ৪৭৫ প্রজাতির মাছের অস্তিত্ব রেকর্ড করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রজাতির মাছ যেমন রূপালী ও সাদা রূপচান্দা, লইট্যা, ছুরি, পোয়া, সাদা দাতিনা, তুল্লার ডান্ডি, বাটা, ফানসা, গুইচ্চা, ভেটকি , লাল পোয়া, চাপাকড়ি, চম্পা, সারডিন, বম মাইট্টা এবং বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি যেমন বাগদা, বাঘতারা, ডোরাকাটা, চাগা, বাঘাচামা, ইরিনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া সাগর পাড়ের অগভীর জলে রয়েছে নানা প্রজাতির জীব যেমন, শামুক, ঝিনুক, কস্তুরা বা ওয়েস্টার, কাঁকড়া, লবষ্টার, শৈবাল বা সী উইড, সামুদ্রিক শসা, শিরোপদী । এছাড়া সাগর উপকূলে নানা প্রজাতির স্পঞ্জ, জেলী মাছ ও প্রবাল রয়েছে।

হালদা নদীতে কালুরঘাট ব্রীজের নিকটে কর্ণফুলী নদীর মুখ থেকে সদরঘাট ব্রীজ এলাকা পর্যন্ত পাঁচলাইশ, হাটহাজারী ও রাউজান থানার অধীনস্থ হালদা ও তার শাখা নদীগুলো ও অংশবিশেষকে মৎস্য অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই সব অঞ্চলে ১৫ মার্চ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের কার্প মাছ (যেমন - রুই, কাতল, মৃগেল, কাল বাউশ, ঘুনিয়া ইত্যাদি) ধরা নিষিদ্ধ।

খনিজ সম্পদ

চট্টগ্রাম জেলা প্রাকৃতিক গ্যাসে সমৃদ্ধ একটি জেলা। ১৯৯৬ সালে এই জেলায় সাঙ্গু নদীর মোহনায় একটি গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করা হয়। সাঙ্গু গ্যাস ক্ষেত্রটি চট্টগ্রাম জেলার ৫০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এবং বঙ্গোপসাগরের ভিতরে ১০ মিটার গভীরতায় অবস্থিত। হিসেব করে দেখা গেছে, এই গ্যাসক্ষেত্রে প্রায় ১,০৪৯ বিলিয়ন কিউবিক ফুট গ্যাস মজুদ রয়েছে।

আবিস্কারের সময়	**১৯৯৬**
গ্যাসের মজুদ	**১,০৪৯ বিলিয়ন কিউবিক ফুট**
আহরণযোগ্য গ্যাসের মজুদ	**৭৩৪ বিলিয়ন কিউবিক ফুট**

কৃষি সম্পদ

কৃষি জমি : কৃষি শুমারী (১৯৯৬) থেকে দেখা যায় যে মোট আবাদকৃত জমির ৫৬% উঁচু জমি, ৩৭% মাঝারি জমি এবং ৬.৩% নীচু জমি। জেলার অধিকাংশ এলাকায় মাঝারি ও নীচু জমিতে বর্ষাকালে পানি জমে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়।

প্রধান ফসল : জেলার অর্থনীতিতে কৃষি কাজের গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষি শুমারী (১৯৯৬) থেকে দেখা যায় যে, প্রায় ২.২৭ লাখ হেক্টর জমিতে কৃষি কাজ করা হয়ে থাকে, যা সমগ্র জেলার প্রায় ৪৩%। জেলার প্রধান ফসল ধান (প্রায় ৯২% জমিতে ধান চাষ করা হয়ে থাকে)। আউশ, বোরো, আমন ধান চাষ এবং উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ করা হয়ে থাকে। কৃষি জমিতে বিভিন্ন জাতের শস্য যেমন স্থানীয় ও উচ্চফলনশীল জাতের ধান, পাট, শাক সবজি, আদা, ডাল, তৈলবীজ চাষ করা হয়। এ ছাড়া অন্যান্য অর্থকরী ফসলের মধ্যে বাদাম, মরিচ, আখ ও আলু অন্যতম। কিন্তু সামগ্রিকভাবে শস্য নিবিড়তার মান ১৮২, যা উপকূলীয় অঞ্চলের গড়ের ও বাংলাদেশের শস্য নিবিড়তার তুলনায় অনেক বেশি।

কৃষি জমির ব্যবহার	
উচ্চ ফলনশীল জাতের আউশ	৬.৮৯%
উচ্চ ফলনশীল জাতের আমন	১৬.৫৩%
উচ্চ ফলনশীল জাতের বোরো	১২.৮২%
স্থানীয় জাতের ধান	৫৪.৫৭%
গম	০.০৬%
আলু	২.৩৯%
সব্জী	১.৭৮%
মসলা	২.৫৮%
ডাল	১.৬০%
তেল বীজ	০.৪২%
আখ	০.১৬%
পাট	০.০৩%

পশু সম্পদ : চট্টগ্রামে ৪৬% গ্রামীণ বাড়িতে গবাদিপশু আছে এবং বাড়ি প্রতি গবাদিপশুর পরিমাণ গড়ে ২.৪২। এই হার উপকূলীয় গড়ের চেয়ে কম।

নদী-সাগরের মাছ : চট্টগ্রামে অভ্যন্তরীণ নদ-নদী ও পুকুর থেকে প্রচুর পরিমাণ মাছ ধরা হয়, যা একদিকে যেমন লোকের খাদ্যের মান বজায় রাখতে সাহায্য করে তেমনি জেলার অর্থনীতিতেও অবদান রাখে। ২০০১-০২ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, জেলার নদ-নদী, মোহনা ও জলাভূমি থেকে প্রায় ১৫ হাজার মেট্রিক টন মাছ ধরা হয়েছে, যা উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ৬%। এ ছাড়াও প্রচুর পরিমাণ লোক সামুদ্রিক মাছ ধরেও জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

মাছ চাষ : ২০০১-০২ সালের হিসাব থেকে দেখা যায় যে, জেলার পুকুরগুলো থেকে প্রায় ৪৮ হাজার মে.টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে (উপকূলের প্রায় ১৭%)। যদি সংস্কারযোগ্য পুকুরগুলোকে মাছ চাষের আওতায় আনা যায় তবে উৎপাদনের পরিমাণ আরো বাড়বে। চট্টগ্রাম জেলায় বর্তমানে প্রায় ৮০৭ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ করা হয়। যদিও এই হার অনেক কম কিন্তু অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ ও লোকজনের উৎসাহের কারণে আশা করা যাচ্ছে যে এই হার আরো বাড়বে এবং জেলার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

লবণ চাষ : চট্টগ্রাম জেলায় মাটি ও পানির লবণাক্ততার কারণে কিছু কিছু এলাকায় লবণ শিল্প গড়ে উঠেছে। চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলায় বিসিকের উদ্যোগে লবণ শিল্পের বেশ প্রসার ঘটেছে। এক হিসেবে দেখা যায় যে, ২০০৩-২০০৪ মৌসুমে বাঁশখালী উপজেলায় মোট ৬,৬২৪ একর জমিতে লবণ চাষ হয়েছিলো এবং মোট ১২২,৮৯২ মে.টন লবণ উৎপাদিত হয়েছিলো।

দুর্যোগ

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস : ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থানের জন্য চট্টগ্রাম জেলা ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা। বঙ্গোপসাগরে প্রধানত দুটি ভিন্ন প্রকারের সাইক্লোন হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সাইক্লোন ও অপরটি হচ্ছে মৌসুমী নিম্নচাপ। সাইক্লোনের সময় বাতাসের গতিবেগ প্রতি ঘন্টায় সর্বোচ্চ ২৪০ কি.মি. পর্যন্ত উঠতে পারে। এর সাথে ৬ থেকে ৭ মিটার উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস এবং তীব্র বৃষ্টিপাতও দেখা যায়।

স্মরণকাল থেকেই চট্টগ্রাম জেলা ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে আক্রান্ত হয়ে আসছে। মাত্রাগত দিক দিয়ে এই জেলা উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত। ১৫৮২ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চলে ৩৩টি ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে। ঘূর্ণিঝড়গুলো প্রধানত মে-জুন এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে আঘাত হানে। জেলার আনোয়ারা, বায়েজিদ বোস্তামী, বাঁশখালী, চিটাগাং পোর্ট, ডাবল মুরিং, হালি শহর, খুলশি, মীর সরাই, পাহাড় তলী, পাঁচলাইশ, পতেঙ্গা, সন্দ্বীপ, সীতাকুন্ড উপজেলার লোকজন বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন।

চট্টগ্রাম জেলার কয়েকটি ঘূর্ণিঝড়ের পরিসংখ্যান

সময়কাল	বাতাসের গতি (কি.মি./ঘণ্টা)	জোয়ারের উচ্চতা (ফিট)	ক্ষয়ক্ষতি
অক্টোবর ১৯৮৩	৯৩	-	-
নভেম্বর ১৯৮৩	১৩৬	-	-
নভেম্বর ১৯৮৬	৯০-১১০	২-৩	-
এপ্রিল ১৯৯১	২২৫	২০	১৩৮,৮৮২ জন মৃত
জুন ১৯৯১	৭৫-১১০	৬	-
মে ১৯৯৭	২২০	১০	-
সেপ্টেম্বর ১৯৯৭	১৫০	৬-১০	-
মে ১৯৯৮	১২০	৬-৮	-

ভূমিকম্প : চট্টগ্রাম জেলার অধিবাসীরা ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট মারাত্মক ঝুঁকির সম্মুখীন। গত আট বছরে এখানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে ২১৫ বার। ১৯৯৭ সালের ২৯ নভেম্বর ৬.৫ মাত্রার ভূমিকম্পে হাজ্জারবাগে ভূমি ধ্বসে মারা গিয়েছিলো ২২ জন। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মিয়ানমার, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের যে ফ্রন্ট লাইন তাতে চট্টগ্রাম ও উত্তরবঙ্গ ভূমিকম্পের জন্য বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিচালিত এক গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, চট্টগ্রামের ৮০% থেকে ৯০% ঘর-বাড়ি ও অবকাঠামো ৬-৭ রিখটার স্কেলের ভূমিকম্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে সরকার প্রণীত বিল্ডিং কোড না মানা। তবে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ভূমিকম্পের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ দালান চিহ্নিত করার কাজ করছে।

আর্সেনিক : বিজিএস ও ডিপিএইচই-র একটি গবেষণা (২০০১) থেকে দেখা গেছে যে, চট্টগ্রাম জেলার নলকুপগুলোতে আর্সেনিকের গড় মাত্রা ৩২ মাইক্রোগ্রাম/লিটার। সমীক্ষাটিতে আরো দেখা গেছে যে, নলকূপগুলোর মধ্যে ১৬%-ই আর্সেনিকের মাত্রা ৫০ মাইক্রোগ্রাম/লিটারের চেয়ে বেশি, যা স্বাস্থ্যগত দিক থেকে গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি।

মাটি ও পানির লবনাক্ততা : চট্টগ্রাম জেলার মাটি ও পানির লবণাক্ততার মাত্রা যথাক্রমে সর্বোচ্চ ১৫ ও ১০ পিপিএম। আনোয়ারা, বায়েজিদ বোস্তামী, বাঁশখালী, চিটাগাং পোর্ট, ডাবল মুরিং, হালি শহর, কর্ণফুলি, কোতোয়ালী, খুলশি, মীর সরাই, পাহাড় তলী, পাঁচলাইশ, পতেঙ্গা, সন্দ্বীপ, সাতকানিয়া ও সীতাকুন্ড উপজেলায় লবণাক্ততা বেশি দেখা যায়।

জলাবদ্ধতা : নগরীতে পানি নিষ্কাশনের জন্য কোন সমন্বিত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকার কারণে প্রতি বছরই বিপুল পরিমাণ এলাকা জলমগ্ন থাকে। চট্টগ্রাম মহানগরীর খাল, ড্রেনসহ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার অনেক এলাকা জবর দখলকারী ও ভূমি দখলকারীদের দ্বারা দখল হয়ে গেছে। ফলে জলাবদ্ধতার সমস্যা দিন দিন আরো প্রকট হচ্ছে। ঐতিহ্যবাহী চাক্তাই খাল পুনর্খননেরও তেমন কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় না।

পাহাড় কাটা : চট্টগ্রাম জেলায় জনবসতি গড়ে তোলার জন্য পাহাড় কাটা চলছে নির্বিচারে। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী প্রশাসনের কিছু লোকের অবৈধ সহযোগিতা নিয়ে আইনকে ফাঁকি দিয়ে ব্যাপকভাবে পাহাড় কেটে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন কর্তৃপক্ষও বিভিন্ন সময়ে আবাসিক এলাকা গড়ে তোলার জন্য পাহাড় কাটে বলে স্থানীয় জনগণের অভিযোগ।

বন্যা : চট্টগ্রাম জেলায় বন্যা একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সবগুলো উপজেলাই কম বেশি বন্যায় আক্রান্ত হয়। ২০০২ সালের বন্যায় এই জেলায় ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি হয়েছিলো।

বন উজাড় : বনদস্যু ও বিভিন্ন বাহিনীদের উপদ্রবের ফলে বিলীণ হয়ে যাচ্ছে শত শত একর বনভূমি। খাস জমি দখল ও নগদ অর্থের জন্য চলে বন ধ্বংসের মহোৎসব। এলাকার জোতদার ও টাউটরা ভূমিহীনদের সামনে রেখে দখল করে নিচ্ছে বনভূমি। ফলে এলাকার পরিবেশ যেমন বিপন্ন হচ্ছে তেমনি ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনাও বেড়ে যাচ্ছে।

পরিবেশ দূষণ : জাহাজ ভাঙা শিল্পের মারাত্মক দূষণের প্রভাবে চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডের সলিমপুর, ভাটিয়ারি, সোনাইছড়ি ও কুমিরা ইউনিয়নের উপকূলীয় জলাশয় এখন বিপদজনক এলাকায় পরিণত হয়েছে। জাহাজ থেকে নিসৃত বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের কারণে সাগর হয়ে পড়ছে মৎস্য শূন্য। মৎস্য শুন্যতার কারণে উপরোক্ত চার ইউনিয়নের প্রায় এক হাজার জেলে পরিবার কর্মসংস্থান হারিয়েছে। পানিতে ভাসমান বিষাক্ত তেলের কারণে জেলেদের জাল পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

বিপদাপন্নতা

বিপদাপন্নতা শব্দটি মানুষের জীবনে বিভিন্ন নেতিবাচক ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা এবং সেই নেতিবাচক ঘটনার সাথে মানুষের অভিযোজনের ক্ষমতাকে বুঝিয়ে থাকে। বিপদাপন্নতার ধরণ, প্রকার ও ব্যপ্তিতে ভিন্নতা আছে। সব রকম বিপদাপন্নতা দ্বারা যেমন জেলার সব এলাকা আক্রান্ত হয় না, তেমনি সব পেশার, সব শ্রেণীর মানুষও সমানভাবে বিপদাপন্ন হয় না। উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের বিপদাপন্নতার উপর পরিচালিত একটি গবেষণায় (সি.ই.জি.আই.এস., ২০০৪) দেখা যায় যে, চট্টগ্রামের মানুষ প্রাকৃতিক এবং আর্থ-সামাজিক কারণে বিপদাপন্ন হয়। চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র কৃষকেরা ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, পেশাগত দক্ষতার অভাব, জমি সংক্রান্ত সমস্যা, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুবিধার অভাব, পণ্যের উপযুক্ত মূল্য ও বাজারজাতকরণের সমস্যা, কৃষি উপকরণের উপযুক্ত মূল্য, উপযুক্ত ঋণ সুবিধার অভাব প্রভৃতি কারণে প্রধানত বিপদাপন্ন হয়। জেলেদের ক্ষেত্রে ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, রাসায়নিক ও কীটনাশক থেকে সৃষ্ট দূষণ, মৎস্য সম্পদ হ্রাস, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, মাছ সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব, দালাল/ব্রোকারদের উপদ্রব, ঋণ সুবিধার অভাব, বাজারজাতকরণের সমস্যা ইত্যাদি প্রধান বিপদাপন্নতা হিসেবে দেখা দেয়। অপরদিকে গ্রামীণ ও শহুরে শ্রমিকরা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুবিধার অভাব, পেশাগত দক্ষতা/জ্ঞানের অভাব, নিম্ন মজুরী, বছরব্যাপী কাজের সুযোগের অভাব, ঘূর্ণিঝড়/সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, বন্যার কারণে বিপদাপন্ন হয়।

চট্টগ্রাম জেলার নির্বাচিত কিছু পেশাজীবীদের বিপদাপন্নতা

ক্ষুদ্র কৃষক	ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, পেশাগত দক্ষতার অভাব, জমি সংক্রান্ত সমস্যা, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুবিধার অভাব, পণ্যের উপযুক্ত মূল্য ও বাজারজাতকরণের সমস্যা, কৃষি উপকরণের উপযুক্ত মূল্য, উপযুক্ত ঋণ সুবিধার অভাব ইত্যাদি।
জেলে	ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, রাসায়নিক ও কীটনাশক থেকে সৃষ্ট দূষণ, মৎস্য সম্পদ হ্রাস, অবৈধ মাছ ধরা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, মাছ সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব, দালাল/ব্রোকারদের উপদ্রব, ঋণ সুবিধার অভাব, বাজারজাতকরণের সমস্যা ইত্যাদি।
গ্রামীণ শ্রমিক	আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, শিক্ষা সুবিধার অভাব, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুবিধার অভাব, পেশাগত দক্ষতা/জ্ঞানের অভাব, নিম্ন মজুরী, বছরব্যাপী কাজের সুযোগের অভাব, ঘূর্ণিঝড়/সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ইত্যাদি।
শহুরে শ্রমিক	গৃহায়ণের সমস্যা, সামাজিক বিধি নিষেধ, মহিলা শ্রমিকদের নিরাপত্তার অভাব, পেশাগত দক্ষতা/জ্ঞানের অভাব, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, স্বাস্থ্যসম্মত পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব, দালাল/ব্রোকারদের উপদ্রব, নিম্ন মজুরী, নগদ অর্থের অভাব, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি।

উৎস: সিইজিআইএস, ২০০৪।

জীবন ও জীবিকা

জনসংখ্যা

চট্টগ্রাম জেলার মোট জনসংখ্যা ৬৫.৪৪ লাখ। যার মধ্যে ৩৪.৪১ লাখ পুরুষ এবং ৩১.০৩ লাখ নারী। লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১১১। মোট জনসংখ্যার ৫০% লোক গ্রামে বাস করে। জেলায় মোট গৃহস্থ/পরিবারের সংখ্যা ১২.২৯ লাখ। প্রতিটি পরিবারে গড়ে ৫.৩ জন মানুষ রয়েছে। যা উপকূলীয় অঞ্চল গড়ের তুলনায় অনেক বেশি। চট্টগ্রাম জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১,২৩৯ জন লোক বাস করে, যা উপকূলীয় অঞ্চল (৭৪৩) এবং বাংলাদেশের (৮৩৯) গড়ের তুলনায় অনেক বেশি। উপজেলা / থানাগুলোর মধ্যে পতেঙ্গা থানায় সবচেয়ে কম লোক বাস করে কিন্তু কোতোয়ালী থানায় জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি।

শহুরে জনগণ (লাখ)	৩.২৯
পুরুষ	১.৭৯
নারী	১.৫০
গ্রামীণ জনগণ (লাখ)	৩.২৫
পুরুষ	১.৬৫
নারী	১.৬০
লিঙ্গ অনুপাত	১০০:১১১
নির্ভরশীল জনগণের অনুপাত	০.৭৯
জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি.)	১,২৩৯

জেলার মোট জনসংখ্যার ৩৮% ০-১৪ বছর বয়সী, যা উপকূলীয় অঞ্চলের হারের তুলনায় কম। অপরদিকে ৬% লোকের বয়স ৬০ বছরের ঊর্ধ্বে। তাই বয়সগত দিক দিয়ে এই জেলার জনগণের নির্ভরশীলতার অনুপাত ০.৭৯ যা উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় কম।

২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ৫০ শতাংশ লোক শহরাঞ্চলে বাস করে। এই অনুপাত ১৯৯১ সালে ছিল ৪৫%। ১৯৯১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত শহরাঞ্চলে বাসকারী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৭%।

নৃ-গোষ্ঠী : ১৯৯১ সালে আদমশুমারী অনুযায়ী দেখা যায় যে, চট্টগ্রাম জেলায় প্রায় ১% জনসংখ্যা বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - চাকমা, কিয়াং, মারমা, মুরং, সাওতাল, তঞ্চঙ্গা, ত্রিপুরা ইত্যাদি।

জনস্বাস্থ্য

জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই জেলায় ৪টি সদর হাসপাতাল ও ১৬টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রয়েছে। হাসপাতালগুলোতে মোট শয্যার সংখ্যা ১,৬৭৪টি এবং শয্যাপ্রতি জনসংখ্যার অনুপাত ৩,৯০৮। এই হার উপকূলীয় অঞ্চলের হারের চেয়ে অনেক কম। যদিও ৭২টি গ্রামীণ ডিসপেনসারী আছে। কিন্তু তাদের সেবার পরিমাণ যথেষ্ট নয়।

শিশু স্বাস্থ্য : এই জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতিহাজারে ৬০ এবং পাঁচ বছর বয়সী শিশুর মৃত্যুর হার প্রতিহাজারে ১০৩। ১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে ৫% অপুষ্টির শিকার। এই হার উপকূলীয় গড়ের চেয়ে কম। মেয়ে শিশুরা অপুষ্টিতে ভোগে ছেলেদের চেয়ে বেশি। অপরদিকে, ৮৬%, ৯১% এবং ৯৪% শিশু যথাক্রমে হাম, ডিপিটি এবং পোলিও রোগের টিকা নিয়েছে। এই হার সমগ্র বাংলাদেশের গড়ের চেয়ে বেশি। জেলার ৪৯% ঘরে আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার রয়েছে।

নির্ভরশীলতার অনুপাত	০.৭৯
নবজাতক মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	৬০
অপুষ্টির মাত্রা	৫%

পানি, পয়ঃ ও বাসস্থান সুবিধা : ১৯৯১ সালের আদম শুমারী থেকে দেখা যায় যে, চট্টগ্রাম জেলার ৫১% ঘরের দেয়াল ইট বা টিনের তৈরী। এই হার উপকূলীয় গড়ের তুলনায় অনেক বেশি। আবার জেলার ৪৯% ঘরের ছাদ ইট বা টিনের তৈরী। এই হার উপকূলীয় গড়ের তুলনায় কম। অপরদিকে ২০০১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী দেখা

যায় যে, ১৪% ঘর ট্যাপের এবং ৭৪% ঘর টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করে। এ ছাড়া ৫% ঘর গভীর নলকূপের উপর নির্ভরশীল। পুকুর ও অন্যান্য উৎসের পানি ৭% ঘরে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চট্টগ্রাম জেলার লোকেরা সমগ্র উপকূলের তুলনায় ট্যাপ ও টিউবওয়েলের পানির সুবিধা বেশি পেয়ে থাকে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরের হিসেব অনুসারে (২০০২) চট্টগ্রাম জেলার গ্রামীণ এলাকায় প্রতি ১৫৫ জন লোকের জন্য একটি সক্রিয় টিউবওয়েল রয়েছে এবং প্রতি বর্গ কি.মি তে সক্রিয় টিউবওয়েলের সংখ্যা ৮টি। তবে আর্সেনিকের মারাত্মক প্রকোপ জেলার লোকদের বিপদগ্রস্ত করেছে। একই হিসেবে আরো দেখা যায় যে, ৮% লোকের কোন প্রকার পায়খানার সুবিধা নেই; ৫৭% ঘরে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধা আছে।

শিক্ষা

চট্টগ্রাম জেলায় শিক্ষিতের হার ৫৫%। এই হার উপকূলীয় গড়ের প্রায় কাছাকাছি। যদিও মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার (৫০%) পুরুষদের (৫৯%) তুলনায় কম। তবুও এই জেলায় মেয়েদের মধ্যে শিক্ষিতের হার উপকূলীয় অঞ্চলের হারের চেয়ে বেশি। অপরদিকে, প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে শিক্ষিতের হার ৫৯%। বাঁশখালীতে শিক্ষিতের হার সবচেয়ে কম এবং কোতোয়ালী ও বোয়ালখালীতে শিক্ষিতের হার সবচেয়ে বেশি।

শিক্ষিতের হার (৭$^+$)	
মোট	**৫৫%**
পুরুষ	**৫৯%**
মহিলা	**৫০%**
শিক্ষিতের হার (১৫$^+$)	
মোট	**৫৯%**
পুরুষ	**৬৬%**
মহিলা	**৫২%**

এই জেলায় মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২,৭৮১টি, যার মধ্যে ১,৬৩৪টি সরকারী। এই বিদ্যালয়গুলোতে মোট ৭.৮৫ লাখ ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করে, যার মধ্যে অর্ধেকই ছাত্রী। এই জেলায় ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের ভর্তির গড় হার ৯৪%, যা উপকূলীয় গড়ের চেয়ে কম। কিন্তু অপরদিকে শিক্ষক প্রতি ছাত্রের অনুপাত (৬০), উপকূলীয় গড়ের (৫০) চেয়ে বেশি এবং জনসংখ্যা অনুপাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘনত্বও অনেক কম (প্রতি ১০,০০০ জনের জন্য ৪.২ টি)।

প্রাথমিক বিদ্যালয়	**২,৭৮১ টি**
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	**৫৯৩ টি**
মাদ্রাসা	**২৩৮ টি**
কলেজ	**১০৫ টি**

এই জেলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৯৩টি এবং এতে মোট ৪.১ লাখ ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করে, যার মধ্যে ৫১%-ই ছাত্রী। জেলায় মোট মাদ্রাসার সংখ্যা ২৩৮টি এবং মোট ৫০ হাজার ছাত্রছাত্রী সেখানে পড়াশুনা করে। এই জেলায় মোট ১০৫টি কলেজ আছে যেখানে প্রায় ১.০১ লাখ ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর পরিচালিত উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের অধীনেও অনেক শিশু প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করছে।

এছাড়া এই জেলায় ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়, ২টি মেডিকেল কলেজ, ১টি টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ১টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ১টি আঞ্চলিক গণপ্রশাসন ইনস্টিটিউট, ১টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ২টি হোমিওপ্যাথি কলেজ, ১টি নার্সিং ইনস্টিটিউট, ১টি ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১টি ভেটেরিনারী কলেজ, ১টি হোম ইকোনোমিকস কলেজ, ১টি বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী, ১টি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, ২টি ল কলেজ, ১টি আর্ট কলেজ, ১টি মেরিন একাডেমী, ১টি মেরিন ফিশারিজ একাডেমী, ১টি ক্যাডেট কলেজ অবস্থিত। এছাড়া

এই জেলায় শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য এশিয়া মহাদেশের প্রথম আর্ন্তজাতিক আবাসিক মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় 'Asian University for Women'-এর প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

অভিবাসন

বন্দর নগরী চট্টগ্রামে কাজের সুযোগের জন্য আশেপাশের জেলা থেকে অনেক লোকই এসে থাকে। বি.বি.এস., ১৯৯১ এর সূত্রানুসারে জেলার মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৭% চট্টগ্রামের বাইরে থেকে আগত।

সামাজিক উন্নয়ন

সাক্ষরতার হার (৭^{+} বছর বয়সী), নিরাপদ পানি সুবিধা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও হাসপাতালে শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা ইত্যাদি বিষয় এলাকার সামাজিক উন্নয়নকে নির্দেশ করে। বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, চট্টগ্রাম জেলা সামগ্রিকভাবে সামাজিক উন্নয়নে এগিয়ে আছে।

অর্থনৈতিক অবস্থা

আয় : চট্টগ্রাম জেলার অধিবাসীদের মোট আয় ১,৮৬২ কোটি টাকা (১৯৯৯/২০০০), যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের মোট আয়ের প্রায় ২৭%। জেলাগত মোট আয়ের দিক থেকে এই জেলা ১ম স্থানে রয়েছে। চট্টগ্রাম জেলায় মানুষের মাথাপিছু আয় ২৮,১১৩ টাকা (১৯৯৯-২০০০), যা উপকূলীয় অঞ্চল গড়ের চেয়ে অনেক বেশি। মাথাপিছু আয়ের দিকে এই জেলা উপকূলীয় জেলাগুলোর মধ্যে ১ম স্থানে এবং সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে ৪র্থ স্থানে রয়েছে।

জেলার মোট আয়ের ৫৩% -ই আসে চাকরি বা সেবামূলক খাত থেকে। আয়ের ১১% কৃষিখাত থেকে আসে, যা উপকূলীয় হারের চেয়ে অনেক কম। অপরদিকে, আয়ের ৩৬% শিল্পখাত থেকে এসে থাকে। চট্টগ্রাম জেলায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রায় ৫.৫ শতাংশ হারে হচ্ছে, যা উপকূলীয় অঞ্চল এবং বাংলাদেশের তুলনায় বেশি।

সক্রিয় জনশক্তি : ১৯৯৯-২০০০ সালের শ্রমশক্তি জরীপ অনুযায়ী দেখা যায় যে, এই জেলায় মোট কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা ৩০.৩৭ লাখ এবং এর মধ্যে ৩২% মহিলা। অপরদিকে দেখা যায় যে, শহরাঞ্চলে মোট কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা ১৮.২০ লাখ, যা জেলার মোট সক্রিয় জনশক্তির ৬০%।

প্রধান জীবিকা দল

কৃষক : কৃষি শুমারী (১৯৯৬) থেকে দেখা যায় যে, গ্রামীণ জনগণের ৫২% পরিবার কৃষি কাজে জড়িত। এদের মধ্যে ৪৫% ক্ষুদ্র কৃষক, ৭% পরিবার মধ্যম এবং ১% পরিবার বড় কৃষক।

কৃষি শ্রমিক : চাষের জমির অভাব, কৃষি উপকরণ ও আর্থিক সামর্থ্যের অভাবের কারণে জেলায় অনেক লোকই তাদের জীবিকার জন্য কৃষি শ্রমের উপর নির্ভরশীল। বিবিএস এর কৃষি শুমারী (১৯৯৬) অনুসারে দেখা যায় যে, জেলায় গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে ২২% পরিবার কৃষি শ্রমিক। এই হার দিনে দিনে বাড়ছে।

শহুরে শ্রমিক : চট্টগ্রাম জেলার শহরাঞ্চলে শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। গ্রামাঞ্চলে কাজের অভাব, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে লোকজন সর্বস্বান্ত হয়ে গ্রাম থেকে শহরে এসে

দিন-মজুরে পরিণত হচ্ছে।

জেলে : জেলার অনেক লোক মাছ ধরার উপর নির্ভর করে থাকে। জেলার মোট গ্রামীণ কৃষক পরিবারের মধ্যে ৭% পরিবার মাছ ধরার উপর নির্ভরশীল। এদের মধ্যে অনেকেই বংশানুক্রমিকভাবে জেলে এবং প্রধানত হিন্দু ধর্মাবলম্বী।

দারিদ্র্য

এই জেলায় পুষ্টি গ্রহণের ভিত্তিতে ৫০% লোক দরিদ্রসীমার নীচে এবং ২৬% লোক অতিদরিদ্র সীমার নীচে বাস করে। এই হার উপকূল ও বাংলাদেশের হারের প্রায় সমান। আবার গ্রামীণ জনগণের ৬৪% পরিবারই ভূমিহীন।

দরিদ্র	**৫০%**
অতি দরিদ্র	**২৬%**
ভূমিহীন	**৬৪%**
ক্ষুদ্র কৃষক	**৪৫%**

নারীদের অবস্থান

উপকূলীয় অঞ্চল ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চট্টগ্রাম জেলার নারীদের অবস্থান কিছুটা ভিন্ন। সিপিডি-ইউএফপিএ কিছু বৈশিষ্ট্যের (যেমন জনসংখ্যার অনুপাত, শিক্ষার হার এবং অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় শ্রমশক্তি) উপর ভিত্তি করে লিঙ্গ সম্পর্কিত উন্নয়নসূচক তৈরি করেছে। এই হিসেব অনুযায়ী চট্টগ্রাম জেলা নিম্নমাত্রার লিঙ্গীয় অসমতাপূর্ণ জেলা। চট্টগ্রাম জেলার নারীদের অবস্থান বিশেষ কিছু সূচকের ভিত্তিতে আলোচনা করা হল।

লিঙ্গ অনুপাত : চট্টগ্রাম জেলার মোট জনসংখ্যার ৪৮% নারী। জেলার লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১১১, যা উপকূলীয় অঞ্চল ও বাংলাদেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অপ্রাপ্ত বয়স্ক (০-১৪ বছর) জনসংখ্যায় লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১১২। কিন্তু প্রজননক্ষম বয়সদলে (১৫-৪৯ বছর) লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১০৮।

প্রজনন স্বাস্থ্য : পরিবার পরিকল্পনা তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (FPMIS-১৯৯৯)-এর তথ্য অনুসারে, জেলায় মাতৃমৃত্যুর হার ৫.৪৬, যা নানা প্রপঞ্চ দ্বারা প্রভাবিত। খাদ্যের অসম বন্টন, ঝুঁকিপূর্ণ সন্তান জন্মদান, আধুনিক স্বাস্থ্য সেবার অভাব যেমন, ডাক্তার, ক্লিনিক ও হাসপাতালের অভাব মায়েদের মৃত্যু হারকে প্রভাবিত করে। চট্টগ্রাম জেলার নারীরা তাদের জীবদ্দশায় গড়ে ২.৫০ টি শিশুর জন্ম দিয়ে থাকেন এবং এই হার ধীরে ধীরে কমে আসছে। জেলার ৩৮% নারী আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ৪১%।

বৈবাহিক অবস্থা : জেলার ১০ বছর ও তার উর্ধ্বে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ২৭% নারী বিবাহিত এবং ১% নারী স্বামী পরিত্যক্তা (বি.বি.এস, ২০০১)। এখানে বিয়ে নিবন্ধনের হার ৮৩% (বি.বি.এস-ইউনিসেফ, ২০০১)।

শ্রমশক্তি : সমগ্র বাংলাদেশের ন্যায় উপকূলীয় অঞ্চলেও নারী পুরুষের কাজের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। নারীরা প্রধানত পরিবারিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রম দেয়। পর্দাপ্রথা, প্রথাগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব, অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা, কঠোর ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদির প্রভাবে অকৃষিখাত বা চাকরি ও সেবামূলক খাতে নারীদের অংশগ্রহণ অনেক কম হয়ে থাকে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত নারীরা নানা ধরনের কাজের সাথে যুক্ত হতে বাধ্য হয়। এ ছাড়া শিক্ষার ক্রমবিস্তার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী, সরকারী ও বেসরকারী সচেতনতামূলক কার্যক্রমের ফলে প্রথাগত ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। শ্রমশক্তি জরিপ (১৯৯৯-২০০০) অনুসারে ১৯৯৯-২০০০ সালে চট্টগ্রাম জেলার মোট শ্রমশক্তির ৩২% ছিল নারী। এই হার উপকূলীয় গড়ের চেয়ে অনেক কম। শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী আরো দেখা যায় যে, শহরাঞ্চলে নারীদের অংশগ্রহণ (৩০%) গ্রামাঞ্চলের (৩৫%) তুলনায় কম এবং তা উপকূলীয় গড়ের তুলনায় অনেক কম। জেলার ১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে মাত্র ২৫% অর্থ বা খাদ্যের বিনিময়ে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ২৬% (নিপোর্ট, ২০০৩)।

নারীর অবস্থান

- সার্বিক ও প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষিতের হার উপকূলীয় অঞ্চল ও বাংলাদেশের হারের চেয়ে অনেক বেশি।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়ে শিশুর ভর্তির হার বেশি।
- সক্রিয় শ্রম শক্তিতে নারীদের অংশ গ্রহণ কম।
- লিঙ্গ অনুপাত (১০০:১১১) নারীর প্রতিকূলে।
- মেয়ে শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার বেশি।
- ঘরে বা বাড়িতে সন্তান প্রসবের হার বাংলাদেশের হারের চেয়ে কম।
- কৃষিজীবী গ্রামীণ পরিবারে নারী প্রধান গৃহের সংখ্যা বেশি।
- মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫ জন , যা জাতীয় (৫ জন) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫ জন) সমান ।
- জেলায় ১৩-৪৯ বয়স দলের নারীদের মধ্যে আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৩৮%, যা জাতীয় (৪৪%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪১%) হারের তুলনায় কম।

কিন্তু, শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হারের তুলনায় নারীদের মজুরী প্রাপ্তি অনেক কম। কৃষি শুমারী (১৯৯৬) অনুযায়ী দেখা যায় যে, ১৬% নারী কৃষি কাজে অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও কোন প্রকার মজুরী পায় না। আবার যারা মজুরী পায় তারা পুরুষদের প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ মজুরী পেয়ে থাকে।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি : স্বাস্থ্য ও পুষ্টিগতমান নারীদের অবস্থানের এক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবার অভাবে নারীদের ৯৩% -ই ঘরে সন্তান প্রসব করে থাকেন। এই হার বাংলাদেশ গড়ের চেয়ে কম। আবার প্রসবকালীন সময়ে ২২% ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাই ও ১১% ক্ষেত্রে ডাক্তাররা সহায়তা করে থাকেন। ৬৭% ক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীরা সহায়তা করে থাকেন।

এই জেলায় নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৬০ জন, যা বাংলাদেশ গড়ের চেয়ে বেশি। কিন্তু, শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার অত্যন্ত বেশি। জেলার ৫% শিশুই চরম অপুষ্টির শিকার এবং মেয়ে শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার (৫%) ছেলে শিশুদের চেয়ে (৪%) বেশি।

শিক্ষা : শিক্ষা ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম জেলার নারীরা কিছুটা এগিয়ে আছে। সার্বিক ও প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষার হার (যথাক্রমে ৫০% ও ৫২%) উপকূল ও বাংলাদেশ হারের চেয়ে অনেক বেশি। যদিও তা পুরুষদের শিক্ষার হারের তুলনায় কম। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তির হার ছেলেদের তুলনায় বেশি। প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক স্কুলগুলো এবং মাদ্রাসাগুলোতে মোট ছাত্রছাত্রীর অর্ধেকই মেয়ে। কলেজগুলোতে প্রায় ৪০% ছাত্রী। এই অবস্থান উপকূলীয় প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

নারী নির্যাতন : ঘরের ভেতরে-বাইরে নারীরা প্রতিনিয়তই নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার। ঘরে নারী নির্যাতন জেলার একটি অতিপরিচিত ঘটনা।

অবকাঠামো

রাস্তা-ঘাট

পাকা রাস্তা	৪,৪০৮ কি.মি.
সওজ রাস্তা	১,২২৮ কি.মি.
এলজিইডি রাস্তা	৩,১৮০ কি.মি
রাস্তার ঘনত্ব	০.৮৩ কি.মি./ বর্গ কি.মি.

এই জেলায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীনে মোট ১,২২৮ কি.মি. রাস্তা নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে জাতীয় মহাসড়ক ১৭৫ কি.মি., আঞ্চলিক মহাসড়ক ৩৩ কি.মি. এবং উপজেলা সদরগুলোর মধ্যে সংযোগকারী সড়ক ১০২০ কি.মি.। এছাড়াও এলজিইডি-র অধীনে ৩,১৮০ কি.মি. রাস্তা নির্মিত হয়েছে। এই জেলায় রাস্তার ঘনত্ব ০.৮৩ কি.মি./ বর্গ কি.মি., যা উপকূলীয় অঞ্চলের ঘনত্বের চেয়ে বেশি। কিন্তু দ্বীপ ও চর অঞ্চলে রাস্তা-ঘাটের অবস্থা ভালো নয়।

পোল্ডার

বাঁধ	৩৪১ কি.মি.
রেগুলেটর	১৫৯ টি
নিষ্কাশন খাল	৫৪৩ কি.মি.

অধিক ফসল উৎপাদন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে গণ-মানুষকে রক্ষার তাগিদে ষাটের দশকে চট্টগ্রাম জেলায় পোল্ডার নির্মাণের কাজ শুরু হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ৩৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে, যা প্রায় ৮৯ হাজার হেক্টর জমিকে লোনা পানির হাত থেকে রক্ষা করে থাকে। ১৫৯টি রেগুলেটর ও ৫৪৩ কি.মি. পানি নিষ্কাশন চ্যানেলের মাধ্যমে পোল্ডারগুলো থেকে পানি নিষ্কাশন করা হয় (সিইআরপি, ২০০০)।

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র

এই জেলায় মোট ৪৯২টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে। এই আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে জেলার ১৫% লোক আশ্রয় নিতে পারে। বছরের অন্যান্য সময় আশ্রয়কেন্দ্রগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

১৯৯৮ সালের হিসেব অনুযায়ী এই জেলায় মোট ১,৩৩৮টি ক্লাব, ২০১টি কমিউনিটি সেন্টার, ২,৯৬৯টি সমবায় সমিতি, ২৯৬টি পেশাজীবী সংগঠন রয়েছে। ৭,১৪০ টি মসজিদ, ১,৪২৬টি মন্দির ও ৮টি চার্চ আছে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান

চট্টগ্রাম জেলায় বেশ কয়েকটি গবেষণা সংস্থার অফিস ও রিসার্চ ষ্টেশন আছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক অবকাঠামো

বিমান বন্দর : চট্টগ্রামে রয়েছে বাংলাদেশের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, "শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর"। এই বন্দর থেকে ভারত, থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশ ও অভ্যন্তরীণ রুটে বিমান চালনা করা হয়।

সমুদ্র বন্দর : চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর। এটি কর্ণফুলী নদীর ডানপাশে বঙ্গোপসাগরের উপকূল রেখা থেকে নয় নটিক্যাল মাইল ভিতরে অবস্থিত। এই বন্দর থেকে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১৫,০০০ মেট্রিক টন পণ্য আমদানি রপ্তানি হয়ে থাকে। তবে এই বন্দরটি বর্তমানে নানা রকম সমস্যায় জর্জরিত। ১৯৯০ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পণ্য

চট্টগ্রাম বন্দরে পণ্য আমদানি রপ্তানির পরিমাণ (মে.টন)

বছর	রপ্তানি	আমদানি	মোট
১৯৯০-৯১	৯১৯	৬২৮২	৭২০১
১৯৯১-৯২	৭৭০	৬২৬৮	৭০৩৮
১৯৯২-৯৩	১১২০	৬৪৯৬	৭৬১৬
১৯৯৩-৯৪	১১৬৯	৬৭২৮	৭৮৯৭
১৯৯৪-৯৫	১৩৫৪	৮৯২৫	১০২৭৯
১৯৯৫-৯৬	১৪৫০	৮৮৫১	১০৩০১
১৯৯৬-৯৭	১৪৩৭	৯১১৭	১০৫৫৪
১৯৯৭-৯৮	১৫২৭	৯৫৬০	১১০৮৭
১৯৯৮-৯৯	১৬৯৭	১২২০৬	১৩৯০৩
১৯৯৯-২০০০	১৭৫৩	১৩৩৮৮	১৫১৪১

আমদানি রপ্তানির গড় পরিমাণ পাশের সারনিতে দেখানো হল।

ব্যাংক ও ঋণ সুবিধা : চট্টগ্রাম জেলায় প্রধান সবগুলো ব্যাংকেরই শাখা রয়েছে। এক হিসেবে দেখা যায় যে, ১৯৯৯-২০০০ সালে জেলার ব্যাংকগুলোতে প্রায় আশি হাজার মিলিয়ন টাকা জমা ছিলো। এই সঞ্চয় ১৯৯৩-৯৪ সাল থেকে ৬৬% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা উপকূলীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রবণতার সাথে সংগতিপূর্ণ।

অপর আরেক হিসাবে দেখা যায় যে, প্রধান চারটি ক্ষুদ্র ঋণ দানকারী এনজিও (ব্র্যাক, আশা, কারিতাস ও প্রশিকা) জেলার প্রায় ১১% পরিবারকে ঋণ দিয়েছে। এ ছাড়া আরো অনেক স্থানীয় এনজিও ঋণ দিয়ে থাকে। এদের মোট সংখ্যা ৯টি, সদস্যসংখ্যা ৯৬,৮০৪ জন (যার মধ্যে ৭০% নারী) এবং ২০০১ সাল পর্যন্ত মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ প্রায় ১০৮ কোটি টাকা।

হাট-বাজার কেন্দ্র : ১৯৯৬ সালের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, চট্টগ্রাম জেলায় মোট ৭২টি হাট-বাজার কেন্দ্র রয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্র গড়ে ৭৩ বর্গ কিলোমিটারের লোকদের সুবিধা দিয়ে থাকে। কিন্তু উপকূলীয় অঞ্চলে গড়ে প্রতি ৮০ বর্গ কিলোমিটারে একটি কেন্দ্র আছে, যা জেলার হাট-বাজারের সুবিধাজনক অবস্থার কথা তুলে ধরে।

বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ : জেলার মোট ৫৬% বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে, যা উপকূলীয় অঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশি। তবে শহর ও গ্রামে বৈদ্যুতিক সংযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। শহরের মোট ৭১% ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। অথচ গ্রামে এর পরিমাণ মাত্র ৪০%। এই হার নগরায়ণের বিস্তারকে চিহ্নিত করে। উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালে জেলার মাত্র ৩৮% ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল। ১৯৯৮ সালের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় এই জেলায় মোট ২৭,৭২৭ টি টেলিফোন সংযোগ রয়েছে।

শিল্প ও বাণিজ্য অবকাঠামো

ইপিজেড: চট্টগ্রামে রয়েছে দেশের স্থাপিত প্রথম ইপিজেড। এটি ১৯৮৩ সালে স্থাপিত হয়। এটি দক্ষিণ হালি শহরে চট্টগ্রাম পোর্ট থেকে ২.৪ কি.মি. দূরে অবস্থিত। ইপিজেডটি ১৮৩ হেক্টর জমির উপর অবস্থিত এবং এখানে মোট ৪২৮টি প্লট আছে।

জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প : শিপ ব্রেকিং কর্মকান্ড বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় বৃহৎ শিল্প। বর্তমানে বিশ্বের শিপ ব্রেকিং শিল্পে বাংলাদেশ দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের শিপ ইয়ার্ডগুলোতেই বিশ্বের সবচেয়ে বড় জাহাজগুলো কাটা হয়। বর্তমানে সীতাকুণ্ডের ভাটিয়ারি ও সোনাইছড়ি ইউনিয়নে শিপ ইয়ার্ডগুলো অবস্থিত। শিপ ইয়ার্ডগুলোতে প্রতিনিয়ত হাজার হাজার শ্রমিক কর্মরত রয়েছে। সেক্ষেত্রে এটি বিশাল এক কর্ম সংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। সরকারি পর্যালোচনায় এটি একটি বৃহৎ রাজস্ব খাত, প্রতিবছর এই শিল্প হতে গড়ে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা রাজস্ব সংগ্রহ করা হচ্ছে। এই শিল্পের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে আরো কিছু বৃহৎ শিল্প যেমন-ষ্টীল রিরোলিং মিল, পুরানো জাহাজ হতে প্রাপ্ত কাঠ ও আসবাবপত্র দ্বারা সৃষ্ট আসবাবপত্রের শত শত কারখানা এবং জাহাজের অন্যান্য মালামাল নিয়ে গড়ে উঠেছে আউট ফিটিংস ব্যবসা। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে এই শিল্পকে কেন্দ্র করে প্রায় ২০টি ফরওয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ছোট বড় শিল্প বা ব্যবসা গড়ে উঠেছে। সুতরাং জেলার জনগণের বড় অংশ শিপ ব্রেকিং শিল্পের উপর নির্ভর করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে এই শিল্প বর্তমানে নানা রকম সমস্যায় জর্জরিত।

শিল্প-কারখানা : এই জেলায় বড় মাঝারি, ক্ষুদ্র সব ধরনের শিল্পই রয়েছে। বড় শিল্পের মধ্যে সিমেন্ট ফ্যাক্টরি, ইস্পাতের মিল, সার কারখানা, তেল কারখানা, ঔষধ ও প্রসাধনি দ্রব্য তৈরির কারখানা, গার্মেন্টস অন্যতম। প্রধান রপ্তানি পণ্য হল - চা, চামড়া, শুটকি মাছ এবং তৈরি পোশাক। ভারী শিল্পের মধ্যে ইস্টার্ন রিফাইনারী, পাহাড়তলী রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, ফৌজী আটার কল, যমুনা তেল কোম্পানী, গ্লাক্সো ওয়েলকাম, লিভার ব্রাদার্স কেডিএস

গার্মেন্টস ইত্যাদি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মধ্যে পাট কল, ধান মাড়াইর কল, আটা তৈরির কল, তেল তৈরির কল, রাসায়নিক কারখানা, সাবান তৈরীর কারখানা, ছাপা খানা, রুটি ও বিস্কুট ফ্যাক্টরী, বরফ কল এবং লোহা লক্কর ও ঝালাইয়ের কারখানা অন্যতম। কুটির শিল্পের মধ্যে বাঁশ ও বেতের কাজ, মাদুর ও পাটি বোনা, স্বর্ণকার, কামার, কুমার, কাঠের কাজ, পিতল ও তামার কাজ, দর্জি প্রভৃতি অন্যতম।

কৃষি অবকাঠামো

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি অনেকাংশেই কৃষি অবকাঠামোর উপর নির্ভরশীল। চট্টগ্রাম জেলার মোট আবাদকৃত জমির মাত্র ৪২% জমিতে সেচ দেয়া হয়। এই হার উপকূল গড়ের চেয়ে বেশি (৩০%) এবং বাংলাদেশ গড়ের (৫০%) চেয়ে অনেক কম। প্রায় ৩৫% জমিতে ভূ-পৃষ্ঠের পানি থেকে সেচ দেয়া হয়। জেলায় মোট ৮৫০৭টি অগভীর নলকূপ, ১১৭টি শক্তিচালিত পাম্প এবং ৫,৬৮৮টি এলএলপি আছে।

সেচ এলাকা (মোট)	৭৫,৭১৬ হেক্টর
সেচ এলাকা (%)	৪২%
ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার	৩৫%
উপরিভাগের পানি ব্যবহার	৭%

কৃষি শুমারী (১৯৯৬) থেকে দেখা যায় ৪৩% গ্রামীণ পরিবার জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে থাকে, ০.৫৮% পরিবার ট্রাক্টর ও ০.৩২% পরিবার পাওয়ার টিলার ব্যবহার করে থাকে। প্রায় ৩ শতাংশ বাড়িতে ধান মাড়াইর কল আছে। ৪৫% বাড়িতে শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। বি.বি.এস. (১৯৯৮)-এর তথ্য অনুসারে, এই জেলায় মোট ৯০টি গুদাম রয়েছে। যাদের মোট ধারণক্ষমতা হল ৬৭৫,১৩৬ মে. টন।

গুদামের ধরন	সংখ্যা	ধারণ ক্ষমতা (মে:টন)
খাদ্য	৪৮	৬১১,৮০৩
বীজ	৩০	৬,০৪৯
সার	১২	৫৭,২৮৪

উন্নয়ন প্রকল্প

উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন প্রকল্পের উপর পরিচালিত এক সমীক্ষা (পিডিও-আইসিজেডএমপি ২০০৪) থেকে দেখা যায়, ২০০৪-২০০৫ অর্থ-বছরে চট্টগ্রাম জেলায় ৪১টি সরকারী প্রকল্প চালু আছে। এই প্রকল্পগুলো ১৫টি সরকারী সংস্থা বাস্তবায়ন করছে। যেসব সরকারি সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বন বিভাগ, পরিবেশ অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস্ কমিশন, বিটিটিবি ইত্যাদি।

সরকারী সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	৪
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	১
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	২
বন বিভাগ	২
পরিবেশ অধিদপ্তর	৩
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	২
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	২
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	৩
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	১
শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়	৩
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	১০
পল্লী বিদ্যুৎতায়ন বোর্ড	৩
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	২
বিটিটিবি	২
ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস্ কমিশন	১

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্প হল - চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প, উপকূলীয় এলাকায় সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পোল্ডার পুণর্বাসন প্রকল্প, জাপানি সহায়তায় বহুমুখি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, ঘূর্ণিঝড় পুণর্বাসন প্রকল্প, বৃহত্তর নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলায় পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প, চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প, বৃহত্তর চট্টগ্রাম বিদ্যুৎ সঞ্চালন প্রকল্প, সীতাকুন্ডে ইকোপার্ক এবং বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপন প্রকল্প, পল্লী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী, তৃতীয় কর্ণফুলী ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প ইত্যাদি। জেলার উন্নয়নে এনজিওদের অবদানও অনস্বীকার্য। এই জেলায় কর্মরত প্রধান এনজিওগুলোর মধ্যে কোষ্ট, কোডেক, কোসেড, ইপসা, কারিতাস, আইএসডিই, কেয়ার, এমসিসি, আশা, এমএমসি, রিক, ব্র্যাক, প্রশিকা অন্যতম।

অমাবস্যায় হালদা নদীতে মা মাছেরা ডিম ছাড়েনি

হতাশ শত শত মৎস্যজীবী

চট্টগ্রামের চাক্তাই খাল ভরাট ও অবৈধ দখল হয়ে যাচ্ছে ॥ জনসাধারণের দুর্ভোগ

Hill cutting continues unabated

পতেঙ্গা উপকূলের ৫ শতাধিক জেলে পরিবার দিন কাটাচ্ছে আতংকে

সীতাকুণ্ড ও বাঁশখালীতে টর্নেডো ॥ পাঁচ ইউনিয়নের আড়াই শ' ঘর বিধ্বস্ত, আহত ৩৫

দক্ষিণ চট্টগ্রামে নদী ভাঙনে কয়েকশ' ঘরবাড়ি বিলীন

বঙ্গোপসাগরের সীতাকুণ্ড উপকূল এখন বিপজ্জনক এলাকা

কেপিএমের বর্জ্যে দূষিত হচ্ছে কর্ণফুলীর পানি

প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছেন দ. পতেঙ্গার মানুষ

চট্টগ্রাম থেকে ইলিশ ভর্তি ট্রলারসহ ৩ জেলে অপহরণ, ভোলায় মুক্তিপণ দাবি

পটিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পানির তীব্র সংকট

গভীর নলকূপটি এক বছর ধরে অকেজো

চট্টগ্রামে বানভাসি মানুষের ঢল

চট্টগ্রামে ব্যাপক নিউমোনিয়া

এক মাসে ২ হাজার চিকিৎসা নিয়েছে, ৩৪ শিশুর মৃত্যু

Chittagong suffers from 82m gallons water shortage daily

বন্যায় থমকে গেছে চাকতাই খাতুনগঞ্জ বাণিজ্য কেন্দ্র

চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল নিজেই এক মুমূর্ষু রোগী

কর্ণফুলীর অব্যাহত ভাঙ্গনে হারিয়ে যাচ্ছে বসতভিটা রাস্তা ফসলী জমি

দ্রুত নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে সাঙ্গু গ্যাস ফিল্ড

সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা

চট্টগ্রাম জেলার মানুষ একদিকে যেমন বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার অপরদিকে পারিপার্শ্বিকতার ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার দ্বারাও আক্রান্ত হয়। প্রাচীনকাল থেকেই এই জেলার মানুষ ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও নদী ভাঙ্গনের সাথে লড়াই করে আসছে। নীচে বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনায় চিহ্নিত প্রধান কিছু সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার কথা আলোচনা করা হল।

পরিবেশগত সমস্যা

পরিবেশগত সমস্যা
- ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস
- ভূমিকম্প
- আর্সেনিক
- মাটি ও পানির লবণাক্ততা
- জলাবদ্ধতা
- পাহাড় কাটা
- বন্যা
- বন উজাড়
- নদী ভরাট
- মাছের প্রজাতি হ্রাস
- পরিবেশ দূষণ

শিল্প উন্নয়নের সমস্যা
- জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের সমস্যা
- লবণ শিল্পের সমস্যা
- পর্যটন শিল্পের সমস্যা

অবকাঠামোগত সমস্যা
- চট্টগ্রাম বন্দরের সমস্যা
- অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা

আর্থ-সামাজিক সমস্যা
- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি
- চট্টগ্রাম মহানগরীর সমস্যা

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস : চট্টগ্রাম জেলার অধিবাসীদের জন্য ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস একটি মারাত্মক দুর্যোগ। ১৯৯১ সালে ২৯ এপ্রিল সংঘটিত স্মরণকালের ভয়াবহতম প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের দীর্ঘ ১৩ বছর পরও চট্টগ্রামবাসীদের সুরক্ষায় কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। এ কারণে তারা বছরের পর বছর ধরে রয়েছে মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে। জেলায় অবস্থিত সাইক্লোন শেল্টারগুলো মোট জনসংখ্যার ১৫% লোককে ঘূর্ণিঝড়ের সময় আশ্রয় দিতে পারে, যা মোটেও যথেষ্ট নয়। তার উপর চট্টগ্রামের পতেঙ্গা, আনোয়ারা, বাঁশখালী, সন্দ্বীপে নির্মিত প্রতিরক্ষা বাঁধ ও উপকূলীয় বাঁধগুলোর অবস্থা অত্যন্ত বিপদজনক। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিলের ঘূর্ণিঝড়ে প্রতিরক্ষা বাঁধ বিধ্বস্ত হওয়ায় চট্টগ্রাম বন্দর, চট্টগ্রাম ইপিজেড, শিল্প কারখানাসহ কয়েক হাজার কোটি টাকার ক্ষয়-ক্ষতি হয়। বিধ্বস্ত হয় দেশের একমাত্র ভারী ইস্পাত কারখানা চিটাগাং ষ্টিল মিল। সেই ধবংসযজ্ঞের পর সরকার বিদেশী সাহায্য সংস্থা ও বিভিন্ন দেশের আর্থিক সহায়তায় বিধ্বস্ত চট্টগ্রাম নগর প্রতিরক্ষা বাঁধগুলো নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সৌদি সরকারের অর্থ সহায়তায় প্রায় ১১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে পতেঙ্গা থেকে কুমিরা পর্যন্ত ২২ কি.মি. দীর্ঘ বেড়িবাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়। এর অধীনে পতেঙ্গায় নেভাল একাডেমি থেকে প্রায় চার কিলোমিটার অংশে সিসি ব্লক বাঁধ নির্মাণ করা হয়। অপর ১৮ কি.মি. বাঁধ নির্মাণ করা হয় মাটি ভরাট করে।

ভূমিকম্প : ভূমিকম্প চট্টগ্রাম জেলার জন্য একটি ভয়াবহ দুর্যোগ হিসেবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ জন্য জেলার অধিবাসীদের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেই। চট্টগ্রামে একটি ভূ-কম্পীয় মান মন্দির (সাইজমিক অবজারভেটরি) আছে। ১৯৫৪ সালে এটি নগরীর আমবাগান নামক স্থানে স্থাপিত হয়। এই মান মন্দিরে কাজ চলতো ফটোগ্রাফিক পদ্ধতিতে। ১৯৮৭ সালে এখানে সংযোজন করা হয় সাইজমোমিটার টাইমার, সাইজমোগ্রাফ ও ভিজুয়্যাল রেকর্ডার। কিন্তু এই মান মন্দিরে উত্তর-পূর্ব ও খাড়া অংশ (নর্থ-ইষ্ট ও ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট) অচল হয়ে আছে দীর্ঘ আট বছর ধরে। কাজ চলছে শুধু উত্তর-দক্ষিণ অংশ দিয়ে। মান মন্দিরের লোকবলও কম। বর্তমান অবস্থায় মান মন্দিরটি ভূমিকম্পের পূর্বাভাস সঠিকভাবে দিতে পারে না।

আর্সেনিক : আর্সেনিক আক্রান্ত জেলাগুলোর মধ্যে চট্টগ্রাম অন্যতম। জেলার নলকূপগুলোর মধ্যে নলকূপগুলোর মধ্যে ১৬ শতাংশেই আর্সেনিকের মাত্রা ৫০ মাইক্রোগ্রাম/লিটারের চেয়ে বেশি, যা স্বাস্থ্যগত দিক থেকে গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি। এত বেশি মাত্রার আর্সেনিক শুধু ত্বকের রোগই সৃষ্টি করে তাই নয়, বেশি দিনের সংক্রমণে এটি ক্যান্সার ও ফুসফুসের রোগ সৃষ্টি করে থাকে।

মাটি ও পানির লবনাক্ততা : পানির লবণাক্ততা একদিকে যেমন সুপেয় পানির প্রাপ্যতা কমিয়ে দেয় অপরদিকে বিভিন্ন ধরনের রোগেরও কারণও হয়ে থাকে। অপরদিকে মাটিতে লবণাক্ততার জন্য সব ধরনের ফসলও হয় না এবং মিঠা পানির অভাবে সব সময় সেচও দেয়া যায় না। এই জেলায় মাটি ও পানির লবণাক্ততার মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ছে।

জলাবদ্ধতা : জলাবদ্ধতা চট্টগ্রাম মহানগরীর একটি প্রধান সমস্যা। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে সিটি করপোরেশন কিছু ড্রেন ও পানি বের হবার পথ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে, কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তবে শুধু চট্টগ্রাম মহানগরীতেই জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় তা নয়, ষাটের দশক থেকে লবণাক্ত পানির প্রবেশ ঠেকানো ও ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য পোল্ডার বানানো শুরু হয়। কিন্তু অপর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, নদীর গতিপথ ও পানিপ্রবাহের দিক পরিবর্তন, অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ নদীতে পলি পড়ার হার পরিবর্তন, পোল্ডারের ভিতরের জলা পথগুলো ভরাট হয়ে যাওয়া প্রভৃতি কারণে এখন চট্টগ্রামের অনেক এলাকাই জলাবদ্ধ হচ্ছে।

পাহাড় কাটা : নির্বিচারে পাহাড় কাটার ফলে বদলে যাচ্ছে জেলার প্রতিবেশ। বন ও উদ্ভিদ হারিয়ে যাচ্ছে। প্রাণীরা হারাচ্ছে তাদের আবাসস্থল।

বন্যা : পাহাড়ি ঢল ও প্লাবনভূমির বন্যায় চট্টগ্রাম জেলার অধিবাসীরা বিপদগ্রস্ত হয়ে থাকে।

বন উজাড় : বন ধ্বংস ঠেকানোর জন্য সরকারের সর্বাত্মক পদক্ষেপ সত্বেও আশংকাজনক হারে বন উজার হয়ে যাচ্ছে। এই হার অব্যাহত থাকলে অদূর ভবিষ্যতে পুরো জেলাই বনশূন্য হয়ে পরবে।

নদী ভরাট : চট্টগ্রামের কর্নফূলী নদীর চাক্তাই এলাকায় বড় বড় গাছ ফেলে এবং অন্যান্য উপায়ে নদী ভরাট করে বহুতল ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। ফলে কর্নফূলী সংকুচিত হয়ে আসছে। তা ছাড়া বান্দরবন, রাঙ্গামাটি এবং খাগড়াছড়ি থেকে প্রতি বছর পাহারি ঢলে চট্টগ্রাম জেলার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীগুলো পলি মাটিতে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ড্রেজিং এর কোন ব্যবস্থা না থাকায় দুকূল উপচে কৃষি ও জনগণের ক্ষতি সাধন করছে। নদী ও খাল গুলো ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে নৌ-পথে ব্যবসা বাণিজ্যও থমকে যাচ্ছে।

মাছের প্রজাতি হ্রাস : অতিরিক্ত মাছ ধরা, পরিবেশ দূষণ প্রভৃতি কারণে তীরবর্তী অঞ্চলগুলোর অগভীর পানির মাছ আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। আগে যে পরিমাণ মাছ পাওয়া যেত এখন আর সেই পরিমাণ পাওয়া যায় না।

পরিবেশ দূষণ : বিভিন্ন শিল্প কারখানা, চট্টগ্রাম বন্দর, জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের উপস্থিতির ফলে জেলার পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। বিষাক্ত পদার্থের প্রভাবে মাছের নার্সারী গ্রাউন্ড হিসেবে পরিচিত সন্দ্বীপ চ্যানেলে মাছের পোনা শূন্য হয়ে পড়েছে। সীতাকুন্ড উপকূলে খালি জায়গায় নির্বিচারে শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড গড়ে ওঠায় মৎস্য সম্পদের উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এসব পানিতে কপার, জিংক, লেড, আয়রণ, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, মার্কারী, নিকেলের মতো বিষাক্ত পদার্থ পাওয়া গেছে, যা মৎস্য সম্পদ ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। এছাড়াও জাহাজ থেকে নিসৃত হচ্ছে তেল ও হাইড্রোকার্বন। এরই প্রভাবে সাগর হতে চলেছে মৎস্য শূন্য। তবে দূষণের মাত্রা কমানোর জন্য এখনো সরকার থেকে উল্লেখযোগ্য কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি।

শিল্প উন্নয়নের সমস্যা

জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের সমস্যা : দেশে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে চলছে নানা অনিয়ম, অথচ সরকার বছরে এই শিল্প থেকে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করছে। কিন্তু এই শিল্প ব্যবস্থাপনা অথবা পরিচালনা করার জন্য এ যাবৎ কোন সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়নি। জাহাজ ভাঙ্গাকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করা হলেও এ শিল্প কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে নেই। শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডগুলোর মান আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার্স এসোশিয়েশন ইউএনডিপির আর্থিক সহায়তায় একটি পাইলট প্রকল্প হাতে নিলেও তা মূলত ফাইল বন্দী হয়ে আছে। নীতিমালা না থাকায় সীতাকুণ্ডের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে যে যেভাবে পারছে শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড গড়ে তুলছে।

এ শিল্পের রয়েছে বহুবিধ সমস্যা যেমন-গ্যাস বিস্ফোরণজনিত দুর্ঘটনায় শ্রমিক হতাহত হওয়া, শ্রম অধিকার লংঘন, শ্রম আইন অনুসরিত না হওয়া, শ্রমিকদের ত্বরিৎ চিকিৎসা, প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাব এবং নিরাপত্তার অভাব প্রভৃতি এই শিল্পের নিত্যনৈমত্তিক ব্যাপার। এছাড়া রয়েছে পরিবেশ দুষণজনীত সমস্যা। নিউক্লিয়ার দূষণের পরেই জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প মারাত্মক পরিবেশ দূষণকারী মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক বিধায় উন্নত বিশ্বে এই শিল্প নেই বললেই চলে।

জাহাজ ভাঙ্গার ফলে মাটি, পানি, বায়ু দূষিত হয়ে পড়ে। সংশ্লিষ্ট এলাকা মৎস্যশুন্য হয়ে যাচ্ছে। মানুষ ভুগছে চর্মরোগ, স্নায়বিক রোগসহ অন্যান্য রোগে। মাটি হারাচ্ছে উর্বরশক্তি। এ ছাড়া রয়েছে মারাত্মক শব্দ দূষণ। কেবল পরিবেশ দূষণ নয়, চট্টগ্রামের শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড সুযোগ সুবিধাহীন পরিবেশে মধ্যযুগীয় শ্রমজীবীদের ন্যায় পুরাতন জাহাজের লোহালক্কর কাটতে কাটতে হাজার হাজার শ্রমিক পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। চিকিৎসা সুবিধা না থাকায় প্রতি বছর গ্যাংগ্রিন আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদের সকলেই হারাচ্ছে হাত, পা, চুলসহ শরীরের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। ইয়ার্ডে কোন ফায়ার ব্রিগেড না থাকার কারণে প্রায়শই বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পাওয়া যায়। দুর্ঘটনাকবলিত হতভাগ্য শ্রমিকদের জন্য নেই কোন হাসপাতাল। অধিকাংশ শ্রমিকই চুক্তিভিত্তিক ভাসমান। ফলে তারা কোন বিপদে পড়লেও কোন দায়-দায়িত্ব শিপ ব্রেকিং কর্তৃপক্ষ নেয় না।

লবণ শিল্পের সমস্যা : লবণ চাষিরা নানা মূখী সমস্যায় জর্জরিত। যেমন লবণের দামের ওঠা-নামা, বৃষ্টি বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পার্শ্ববর্তী দেশগুলো থেকে লবণের চোরা চালান, সরকারি সাহায্য সহযোগিতার অভাব, কম উৎপাদনশীলতা ইত্যাদি।

পর্যটন শিল্পের সমস্যা : চট্টগ্রাম জেলায় পর্যটন শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যার কারণে যে রকম পর্যটক আসার কথা সে রকম আসে না। সমস্যাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পর্যটকদের জন্য বিশেষ করে আন্তর্জাতিক পর্যটকদের থাকার জন্য ভাল হোটেলের অভাব, অপর্যাপ্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা, পর্যটন স্থানে পর্যটকদের নিরাপত্তার অভাব, কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতার অভাব, উপযুক্ত প্রচার প্রচারণার অভাব ইত্যাদি।

অবকাঠামোগত সমস্যা

চট্টগ্রাম বন্দরের সমস্যা : দেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম বন্দর বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বন্দরগুলোর তালিকায় দ্বিতীয় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। অব্যাহত পলি পড়ে নাব্যতা হারানো, জাহাজ চলাচলে সমন্বয়হীনতা, মালামাল উঠানো নামানোর ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জটিলতা, কন্টেইনার জট ও দুর্নীতি এবং কর্মরত শ্রমিকদের অদক্ষতা প্রধান কারণ বলে চিহ্নিত করা হয়। চট্টগ্রাম পোর্টের কার্যক্রম দক্ষ জনবলের অভাবে মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে।

অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা : চট্টগ্রামে আছে একটি আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দর ও বিমান বন্দর। একই সাথে এটি একটি শিল্প অধ্যুষিত নগরী। কিন্তু রাস্তা-ঘাটগুলো অপ্রশস্ত এবং নেই কোন ফুটপাত। তার উপর রাস্তাগুলো বেদখল করে এক শ্রেণীর অসাধু লোক ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র চাক্তাই, খাতুন গঞ্জ, আসাদগঞ্জ ও কেরানী গঞ্জে পরিকল্পিত কোন রাস্তা-ঘাট না থাকায় সময়ের অপচয় ছাড়াও সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে।

চট্টগ্রাম জেলায় রাস্তাঘাটের গড় ঘনত্ব ভালো থাকলেও রাস্তাঘাটের অবস্থা ভালো নয়। মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আন্তজেলা সড়কগুলোর করুণ অবস্থা। চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার যাওয়ার পথে যান-বাহনগুলোকে চলাচল করতে হচ্ছে মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে। চট্টগ্রাম-রাউজান সড়কের অধিকাংশ ব্রীজ-কালভার্ট মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। সড়ক ও জনপথ বিভাগ কয়েকটি সেতুতে ব্যবহারের অনুপযোগী ও ঝুঁকিপূর্ণ সাইনবোর্ডও ঝুলিয়ে দিয়েছে। এ সড়কের উপর দিয়ে প্রতিদিন কয়েকটি রুটের শত শত যানবাহন চলাচল করে। চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর উপর স্থাপিত কালুরঘাট ব্রীজের জরাজীর্ণ দশা। শতাব্দী প্রাচীন এই ব্রীজ মেরামতের জন্য ১০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প নেয়া হয়েছে ও সাময়িকভাবে যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। বন্যা ও অতিরিক্ত বর্ষণের ফলে সড়কগুলোর বিভিন্ন স্থানে পিচ উঠে যায়। তাছাড়া রাস্তার দু'পাশের দোকান, মার্কেট, বাড়ি-ঘরগুলো উঁচু হওয়ার কারণে বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি প্রবাহিত হতে না পেরে রাস্তার উপর আটকে থাকে। সড়ক উন্নয়নে কম অর্থ বরাদ্দ, সড়ক উন্নয়ন ও মেরামতের প্রধান বাধা বলে জানা যায়।

চট্টগ্রামের সামুদ্রিক জলসীমা দিয়ে প্রচুর সংখ্যক যানবাহন চলাচল করে। এদের মধ্যে অনেকগুলোই নির্মাণের উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়নি। আবার শুধুমাত্র নদীতে চলার উপযুক্ত নৌযানও সমুদ্রসীমায় চলাফেরা করে থাকে। ফলে নৌ দুর্ঘটনার ঝুঁকি ক্রমাগত বাড়ছে। চট্টগ্রাম নৌ-বন্দরে চলাচলকারী জাহাজগুলোও বিভিন্ন সময়ে দুর্ঘটনায় পড়ে থাকে। ১৯৮৯, ১৯৯১ ও ২০০৩ সালে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে।

মূল ভূ-খণ্ড থেকে দ্বীপগুলোতে যাওয়ার একমাত্র মাধ্যম জলপথ। নৌযান ও সি-ট্রাকগুলোর চলাচল জোয়ার ভাটার উপর নির্ভর করে। আবার জলযানগুলো সুষ্ঠু ডিজাইনের অভাব, অতিরিক্ত যাত্রী বহন, চালকদের প্রশিক্ষণের অভাব, ডুবো চর ও নদীর তীব্র স্রোত, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি কারণে নিরাপদ নয়। নদী বন্দর ও ঘাটের খারাপ অবস্থার কারণে বিশেষ করে শিশু ও নারীরা সমস্যার সম্মুখীন হন।

আর্থ-সামাজিক সমস্যা

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি : আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি চট্টগ্রাম জেলার জন্য একটি বড় সমস্যা। নানা কারণে সুষ্ঠু আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখা প্রশাসনের জন্য সমস্যা হয়ে যায়। চরাঞ্চল, সাগর ও নদী বক্ষ, চট্টগ্রাম পোর্ট, আন্তর্জাতিক সীমানা, বিভিন্ন কলকারখানা, বনভূমিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান, স্থাপনা ও সম্পদ থাকার কারণে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষা করার জন্য প্রশাসনিক সক্ষমতা দরকার তা এই মুহূর্তে নেই। অন্যদিকে পাহাড়, বনাঞ্চল ও দুর্গমতার কারণে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা আরো কঠিন। সব মিলিয়ে জেলার সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরো উন্নয়নের অবকাশ আছে।

চট্টগ্রাম মহানগরীর সমস্যা : চট্টগ্রাম জেলায় বিপুল সংখ্যক লোক নগরাঞ্চলে বাস করে। চট্টগ্রাম মহানগরীতেই বাস করে প্রায় ৩.৫ লাখ লোক। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও সরকারের সর্বাত্মক পদক্ষেপ সত্বেও নগরবাসীর জীবন নানামুখী সমস্যায় জর্জরিত। এসব সমস্যার মধ্যে প্রধান হলো - ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, জলাবদ্ধতা, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সুবিধার অভাব, পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সুবিধার অভাব, নিরাপদ পানীয় জল ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, ভূমিকম্প ইত্যাদি।

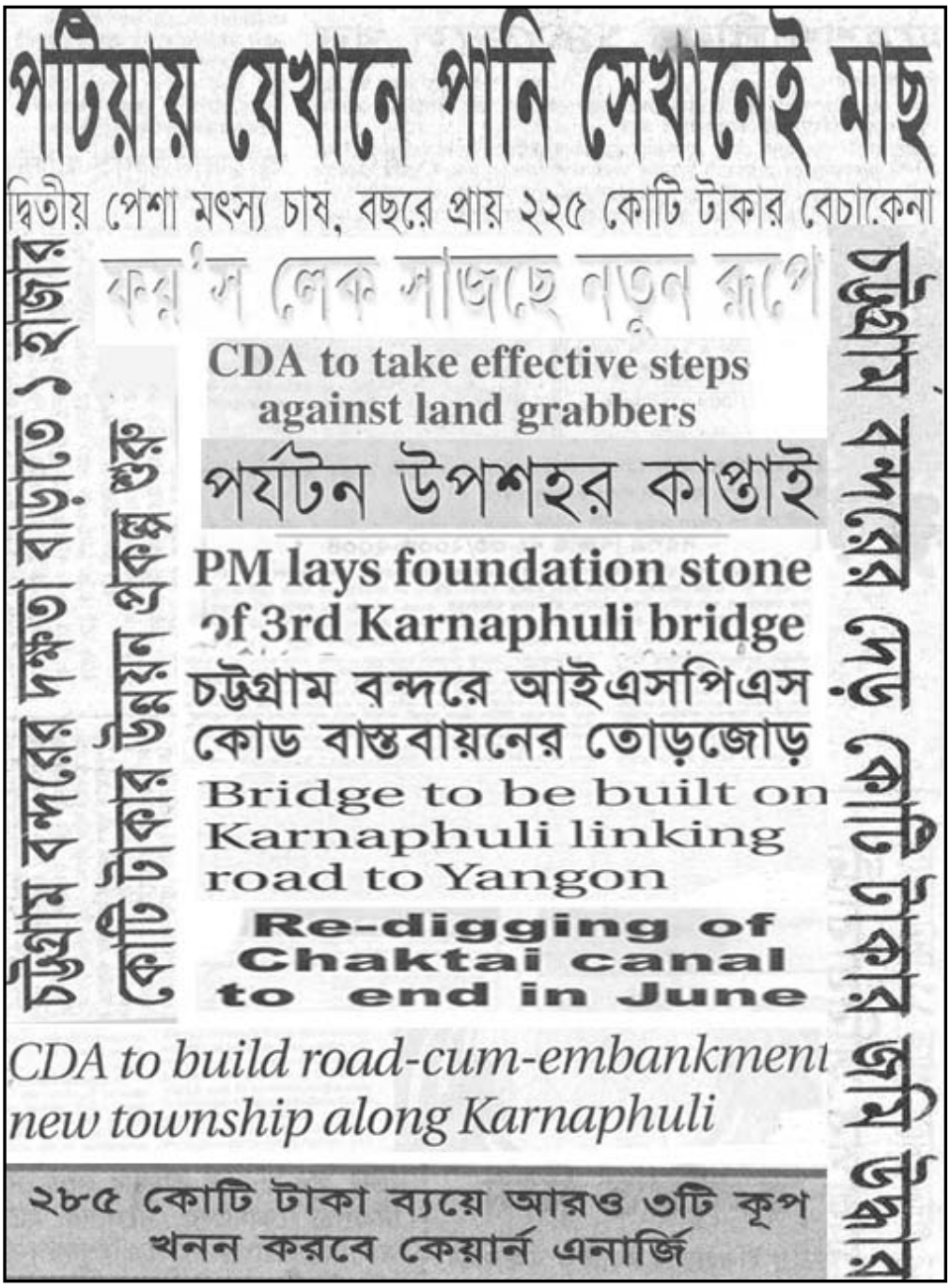

পটিয়ায় যেখানে পানি সেখানেই মাছ

দ্বিতীয় পেশা মৎস্য চাষ, বছরে প্রায় ২২৫ কোটি টাকার বেচাকেনা

চট্টগ্রাম বন্দরের দক্ষতা বাড়াতে ১ হাজার

কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প শুরু

ফয়'স লেক সাজছে নতুন রূপে

CDA to take effective steps against land grabbers

পর্যটন উপশহর কাপ্তাই

PM lays foundation stone of 3rd Karnaphuli bridge

চট্টগ্রাম বন্দরে আইএসপিএস কোড বাস্তবায়নের তোড়জোড়

Bridge to be built on Karnaphuli linking road to Yangon

Re-digging of Chaktai canal to end in June

চট্টগ্রাম বন্দরের দেড় কোটি টাকার জমি উদ্ধার

CDA to build road-cum-embankment new township along Karnaphuli

২৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে আরও ৩টি কূপ খনন করবে কেয়ার্ন এনার্জি

সম্ভাবনা ও সুযোগ

বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামে মানুষের সামগ্রিক জীবনমানের উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সম্পদ ও সুযোগের উপযুক্ত ব্যবহার করে জেলার প্রভূত উন্নয়ন সম্ভব। বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনায় চিহ্নিত কয়েকটি প্রধান সম্ভাবনার কথা নিচে আলোচনা করা হল।

শিল্প উন্নয়ন

শিল্পাঞ্চল : চট্টগ্রামে বর্তমান ইপিজেড-এর পাশাপাশি আরো একটি সরকারি ইপিজেড স্থাপনের কাজ চলছে। দেশের সপ্তম রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) হিসেবে কর্ণফুলী ইপিজেডে প্লট বরাদ্দের কাজ চলছে। চট্টগ্রামে এটি হচ্ছে দ্বিতীয় সরকারি ইপিজেড। চট্টগ্রাম বন্দর ও বিমান বন্দরের মাঝামাঝি অবস্থানে আগের চিটাগাং ষ্টিল মিলের ২২২ একর সরকারি জমিতে এই ইপিজেড প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করার ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে নেয়া হচ্ছে ৭৪ একর জায়গা। পর্যায়ক্রমে এই প্রকল্পের পরিসর বাড়ানো হবে। এই ইপিজেডের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত ৭৪ একর জায়গায় ১০০টি শিল্প প্লট তৈরি করা হবে - যার প্রতিটির আয়তন হবে ২০০০ বর্গ মিটার বা আধা একর। এটি দেশী বিদেশী বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

শিল্প উন্নয়ন
- শিল্পাঞ্চল
- শিপব্রেকিং শিল্প
- পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন
- জ্বালানি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন
- দ্বীপাঞ্চলের উন্নয়ন
- নারী শিক্ষার সুযোগ
- নিরাপদ পানি সরবরাহ

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার ও সংরণ
- সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ
- বনজ সম্পদের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ
- জমির সুষ্ঠু ব্যবহার
- জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ

কৃষি সম্পদ উন্নয়ন
- কৃষি উন্নয়ন
- মাছ চাষ
- চিংড়ি চাষ
- লবণ শিল্পের উন্নয়ন

অবকাঠামোগত উন্নয়ন
- অবকাঠামো সংরক্ষণ
- চট্টগ্রাম বন্দর উন্নয়ন
- কর্ণফুলী নদীর উপর তৃতীয় ব্রীজ

পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন : বিভিন্ন ঐতিহ্যমন্ডিত ও মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বলিত স্থানের উপস্থিতির ফলে চট্টগ্রাম জেলায় পর্যটন শিল্প বিকাশ লাভ করেছে। তবে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে এই শিল্পের আরো উন্নতি সম্ভব।

শিপব্রেকিং শিল্প : শিপব্রেকিং শিল্প সম্পর্কে সরকারের কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। মূলত সরকারী কোন পৃষ্ঠপোষকতা না থাকার কারণেই এই শিল্প দ্রুত প্রসারে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। এছাড়া প্রতিনিয়ত নেতিবাচক ধারণার কারণে এই শিল্প ক্রমশ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। তাই এই শিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে দেশের মানুষ পুরোপুরি সচেতন নয়।

এমতাবস্থায় এই শিল্পের বিদ্যমান নানাধরনের সমস্যা সমাধানকল্পে সুনির্দিষ্ট ও সুসমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সময়ের দাবি হয়ে দাড়িয়েছে। এই শিল্পের সকল সমস্যা ও ইতিবাচক দিকগুলো বিবেচনায় রেখে এই শিল্প সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ও সুসমন্বিত নীতিমালা প্রয়োজন যেটির দ্বারা এই শিল্পের শ্রমিক অধিকার, পরিবেশ দুষণ রোধ এবং উপকূলীয় মানুষের জীবনমান উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

জ্বালানি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন : চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে নগরীতে বর্জ্য পদার্থ ব্যবহার করে জ্বালানি উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিদিন আটশ' টন ময়লা আবর্জনা সংগৃহীত হয়। এসব আবর্জনা করপোরেশনের

ব্যবস্থাপনায় নগরীর হালিশহর এবং রৌফাবাদ এলাকায় ডাম্পিং করা হয়। ২০০২/০৩ সালের দিকে ডাচ সরকারের প্রযুক্তিগত ধারণা থেকে ময়লা আবর্জনা ব্যবহার করে বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদনের পরিকল্পনা নেয়া হয়। পরবর্তীতে করপোরেশনের প্রকৌশলীরা ময়লা আবর্জনা থেকে জ্বালানি এবং জৈব সার তৈরির পদ্ধতি অবিষ্কার করেন। সম্পূর্ণ দেশী প্রযুক্তিতে ছয়টি ধাপে জ্বালানি পদার্থ উৎপাদন করা হয়। অন্যান্য জ্বালানির তুলনায় গুনগতমানের দিক থেকে এই জ্বালানি উন্নত এবং দাম অনেক কম। এই প্রকল্পে প্রতিদিন ১০ টন জ্বালানি পদার্থ উৎপন্ন হবে। করপোরেশন জ্বালানি পদার্থ তৈরির প্রকল্প বাস্তবায়নের পর জৈব সার উৎপাদনের প্রকল্প হাতে নেবে। বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদনের পরিকল্পনাও রয়েছে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

দ্বীপাঞ্চলের উন্নয়ন : চট্টগ্রাম জেলায় বেশ কয়েকটি মানব বসতিপূর্ণ দ্বীপ আছে। প্রাকৃতিক কারণে এসব দ্বীপের অধিবাসীরা বিপদসংকুল থাকে। তদুপরি পর্যাপ্ত অবকাঠামো ও পরিবেশের অভাবে জনগণের সামাজিক উন্নয়নও বাধাগ্রস্ত হয়। তাই এসব এলাকার উন্নয়নের জন্য যথাযোগ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের অবকাশ আছে। এর ফলে সামগ্রীকভাবে জেলার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

নারী শিক্ষার সুযোগ : চট্টগ্রামে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য এশিয়া মহাদেশের প্রথম আর্ন্তজাতিক আবাসিক মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় 'Asian University for Women'-এর প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ৬,০০০ কোটি টাকা বাজেটের এই প্রকল্পের জন্য ইতিমধ্যে পাহাড়তলীর নিকট ১০৪ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সংযোগ সড়ক, ব্রীজ ও রাস্তা নির্মাণের জন্য ৩৩ কোটি টাকার একটি পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এটি এশিয়াতে আন্তর্জাতিক মানের দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েরা তথ্যপ্রযুক্তি, পরিবেশ প্রকৌশল, টেকসই উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, কলা এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর পড়ার সুযোগ পাবে। ২০০৬ সাল নাগাদ নির্মাণ কাজ শেষ হবার পরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫% বাংলাদেশী ছাত্রী ও ৭৫% বিদেশী ছাত্রী ভর্তি হবার সুযোগ হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি বাংলাদেশের ছাত্রীদের জন্য শিক্ষার একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এর পাশাপাশি দেশের দ্বিতীয় মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তরও চট্টগ্রামের হালিশহরে স্থাপন করা হয়েছে। প্রতি বছর এখানে ১৬০ জন ছাত্রী ভর্তি হতে পারবে।

নিরাপদ পানি সরবরাহ : খাবার তীব্র সংকট ভোগা চট্টগ্রাম মহানগরীর অধিবাসীদের পানি সরবরাহের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম পানি ও পয়:নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ ২০০ কোটি টাকার মোহরা পানি সরবরাহ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কম্পোনেন্ট হল হালদা নদীর তীরে পানি পরিশোধন প্লান্ট, ১০৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পানি সরবরাহ লাইন স্থাপন এবং পতেঙ্গা বুষ্টার স্টেশনের পুণর্বাসন এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি। ২০০৭ সাল নাগাদ এই প্রকল্প শেষ হলে মহানগরীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অধিবাসীকে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা যাবে।

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার ও সংরক্ষণ

সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ : চট্টগ্রাম জেলায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য সামুদ্রিক মাছ ধরার উপর নির্ভরশীল। উন্নত মাছ ধরার উপকরণ, বাজারজাতকরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা, সমুদ্রে

নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থা করা গেলে মাছ আহরনের পরিমাণ অনেক বাড়ানো সম্ভব। উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন এবং মাছ সংরক্ষণের ব্যবস্থা ও ফড়িয়াদের উপদ্রব কমানোর ব্যবস্থা জেলেদের মাছের উপযুক্ত মূল্য পেতে সহায়তা করবে। তবে মৎস্য আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে তীরবর্তী এলাকার মাছের উপর চাপ কমিয়ে আনা সম্ভব হবে এবং গভীর সমুদ্রের মাছের আহরণ বাড়ানো সম্ভব হবে। চট্টগ্রামে কাঁকড়া চাষের একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে। ইতিমধ্যে কিছু এলাকায় কাঁকড়া চাষ শুরু হয়েছে। তবে এই হার আরো বাড়ানো যায়।

বনজ সম্পদের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ : চট্টগ্রাম বন বিভাগ (দক্ষিণ) চট্টগ্রাম দক্ষিণাঞ্চলের ক্ষয়প্রাপ্ত বনভূমিতে পুনরায় বন সৃজন করার জন্য অংশীদারিত্বমূলক বনায়ন কার্যক্রম শুরু করেছে। এই কার্যক্রমটি এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি করেছে। অংশগ্রহণকারীরা গাছ দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন, বিনিময়ে আয়ের একটি অংশ পাবেন। এখন পর্যন্ত এই কার্যক্রমের অধীনে প্রায় ২২০০ একর জমিতে বন সৃজন করা হয়েছে এবং প্রায় ২০০০ উপকারভোগী অংশ নিচ্ছে।

চট্টগ্রাম জেলার সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় প্রচুর পরিমাণ এলাকা জুড়ে ম্যানগ্রোভ বন সৃজন করা হয়েছে। এই বন একদিকে যেমন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ কমায় অপরদিকে স্থানীয় লোকজনের কাঠ, জ্বালানি, পশু খাদ্যের চাহিদা পূরণ করে। যদিও ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে অনেক এলাকাতেই বন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বনজ সম্পদের চাহিদা রয়ে গেছে। তাই স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে বাঁধ, রাস্তা, সাইক্লোন শেল্টার, স্কুল, অফিস, খাস জমিতে সামাজিক বনায়নের বেশ সুযোগ রয়েছে।

জমির সুষ্ঠু ব্যবহার : চট্টগ্রাম অত্যন্ত ঘনবসতি পূর্ণ জেলা। এখানে বিচিত্র ধরনের সম্পদ যেমন পাহাড়, নদী, বন, মৎস্য, লবণ, বেলাভূমি, গ্যাস ক্ষেত্রের সমাহার ঘটেছে। রয়েছে জাতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, যেমন চট্টগ্রাম বন্দর, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, বিভিন্ন শিল্প কারখানা ইত্যাদি। এসবগুলো সম্পদ ও স্থাপনার পরিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা। এছাড়া চট্টগ্রামে জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে বাড়ছে। এই বাড়তি জনসংখ্যার চাহিদা মিটানোর জন্যও ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা দরকার। ইতিমধ্যেই চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন ও চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম মহানগরীর মাষ্টার প্লান তৈরি ও ব্যবহারের পদক্ষেপ নিয়েছে।

জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ : চট্টগ্রাম জেলার চুনতিতে একটি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য কেন্দ্র, সীতাকুন্ডে একটি ইকোপার্ক, হালদা নদীতে একটি মৎস্য অভয়ারণ্য আছে। এই সব স্থানগুলোকে ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা গেলে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা যাবে। ফয়'স লেকসহ সংলগ্ন এলাকায় ১৬৭ একরের উপর একটি বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপনের একটি পরিকল্পনা সরকার বাস্তবায়ন করছে। এই গার্ডেনে বিভিন্ন ধরনের দেশী বিদেশী জাতের বাঁশ, বেত, ঔষধি গাছ লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে। তবে বিভিন্ন ধরনের দীর্ঘসূত্রতার কারণে এই পরিকল্পনা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ ফরেস্ট্রি এ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসে বিরল প্রজাতির গাছ ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে।

কৃষি সম্পদ উন্নয়ন

কৃষি উন্নয়ন : জলাবদ্ধতা কৃষির উন্নয়নে একটি প্রধান বাঁধা। বৃষ্টির পানি যাতে জমিতে জমে না থাকতে পারে সে ব্যবস্থা করা হলে উচ্চ ফলনশীল জাতের আউশ, রোপা আমন এবং রবি শস্যের প্রচুর পরিমাণ আবাদ করা যেতে পারে। এ ছাড়া সুষম সার প্রয়োগ, জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি, উন্নত জাতের বীজের ব্যবহার এবং উন্নত পরিচর্যার মাধ্যমে বর্তমানে উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব।

মাছ চাষ : চট্টগ্রাম জেলার প্রায় ৫৬% পুকুরে মাছ চাষ করা হয়ে থাকে এবং হেক্টর প্রতি মাছের উৎপাদন বছরে ৩.৪ মেট্রিক টন। আবার পরিত্যক্ত ও চাষযোগ্য পুকুরের পরিমাণ ৪৬%, যেখানে মাছের গড় উৎপাদন বছরে ১.৯৭ মে.টন/হে.। এর হার উপকূলীয় ও বাংলাদেশ গড়ের চেয়ে বেশি। কিন্তু যদি জেলার সমস্ত পুকুরগুলোকে উন্নত মাছ চাষ পদ্ধতির আওতায় আনা হয় তবে উৎপাদন অনেক বেড়ে যাবে। চট্টগ্রামের কিছু কিছু উপজেলায় লোকজন সমবায় ভিত্তিতে মাছ চাষ করে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে।

চিংড়ি চাষ : চট্টগ্রাম জেলার ঈষৎ লবণাক্ত মাটি ও পানি গলদা ও বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে থাকে। বর্তমানে চর এলাকার প্রচুর পরিমাণ জমি চিংড়ির ঘের তৈরিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। যদি উন্নত ও পরিবেশ বান্ধব নিবিড় পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা হয় তবে তা মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করবে।

লবণ শিল্পের উন্নয়ন : চট্টগ্রাম জেলায় এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র বাঁশখালী উপজেলাতেই লবণ শিল্পের বিকাশ ঘটেছে। বিসিক উৎপাদিত উন্নত লবণ চাষ পদ্ধতি ব্যবহার করে লবণের গুনগতমান ও উৎপাদনের হার অনেক গুন বাড়ানো সম্ভব।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

অবকাঠামো সংরক্ষণ : চট্টগ্রাম একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ জেলা। তাই জনগণের জানমালের নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত অবকাঠামো যেমন বাঁধ ও পোল্ডার, স্লুইস গেট ও রেগুলেটর, সাইক্লোন শেল্টার ও সংযোগ সড়ক, কিল্লা ইত্যাদি একটি সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে নির্মাণ, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের এবং সতর্ক সংকেত ব্যবস্থার উন্নতির অবকাশ রয়েছে।

চট্টগ্রাম বন্দর উন্নয়ন : চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য একটি বন্দরকেন্দ্রিক বহু সংযোগভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সহায়তায় Dhaka Chittagong Economic Corridor নামক একটি সমীক্ষা হাতে নেয়া হয়েছে। এই সমীক্ষাটিতে একটি নতুন মুরিং টার্মিনাল, ওয়েল ট্যাংকারগুলোর জন্য গভীর পানিতে নোঙ্গরের সুবিধা, টোল আদায়ের জন্য বহু লেনভিত্তিক ব্যবস্থা বর্তমান সড়কগুলোর উন্নয়ন এবং ঢাকা-চট্টগ্রামের মধ্যে উচ্চগতির রেলওয়ে লাইন স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হবে। পণ্য পরিবহনের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে উচ্চ গতিসম্পন্ন ফেরি সার্ভিস স্থাপনের সম্ভাব্যতাও যাচাই করা হবে। বন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তহবিলে একটি Container Terminal তৈরী হচ্ছে।

কর্ণফুলী নদীর উপর তৃতীয় ব্রীজ : কর্ণফুলীর উপর পরিকল্পিত এই ব্রীজটি আঞ্চলিক যোগাযোগের একটি নতুন ক্ষেত্র তৈরি করবে।

ভবিষ্যতের রূপরেখা

	২০০১	২০১৫	২০৫০
মোট লোক সংখ্যা (লাখ)	৬৫.৪৪	৮৫.৩৯	১৩০
পুরুষ	৩৪.৪০	৪৩.১৩	৬৪.৯৩
নারী	৩১.০৩	৪২.২৭	৬৪.৯৩
নারী ও পুরুষের অনুপাত	১১১	১০২	১০০
শহুরে জনসংখ্যা (%)	৫০	৫৮	৮৮

চট্টগ্রাম জেলায় বর্তমান জনসংখ্যা ৬৫.৪৪ লাখ (২০০১)। ধারনা করা হচ্ছে এই লোক সংখ্যা বেড়ে আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ হবে ১ কোটি ৩০ লাখ। ২০১৫ সাল বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন কৌশল বাস্তবায়নের শেষ বছর। এই সময় নাগাদ লোক সংখ্যা হতে পারে ৮৫ লাখের উপরে। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা) পূরনের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি চলছে। মানুষের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। অবকাঠামো ও সরকারি পরিসেবার আরো অগ্রগতি হবে।

চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের সুযোগ ও সম্ভাবনা ব্যাপক। মিয়ানমার, নেপাল, ভুটান ও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর ব্যবসা-বাণিজ্যে এই বন্দর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদিশেক মুদ্রা আয় করতে পারে।

নগরীর তীব্র আবাসন সমস্যা লোপের জন্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্ণফুলী নদীর পশ্চিম পাশে আবাসিক এলাকা গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে ২০১৫ সাল নাগাদ ২৫ লাখ লোকের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে। ৩৪২ কোটি টাকার এই প্রকল্পটি বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন রয়েছে।

চট্টগ্রামের ফয়'স লেককে একটি বিশ্বমানের পর্যটন ও বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কাজ চলছে। শিশু-কিশোরসহ সব বয়সের মানুষের আনন্দের উপকরণে সজ্জিত করতে ১০৩ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন হচ্ছে ফয়'স লেক আধুনিকায়ণ প্রকল্প। পর্যটন করপোরেশনের সঙ্গে ৫০ বছর মেয়াদি বিল্ড, অপারেট এ্যান্ড ট্রান্সফার (বিওটি) চুক্তিতে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এক একর জমির উপর বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন চট্টগ্রাম রেল স্টেশনের নিকট অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধাসম্বলিত ১০ তলা একটি হোটেল নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। ৮০০ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ের এই প্রকল্প আগামী ২০০৬ সাল নাগাদ শেষ হবে।

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন কর্তৃপক্ষ হালিশহরে ১০ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে একটি বায়োগ্যাস প্রকল্প স্থাপন করেছে। জ্বালানির উপাদান হিসেবে নগরীর সংগৃহীত আবর্জনা ব্যবহার করা হবে। পুরোপুরিভাবে চালু হলে প্রতিদিন প্রায় ১০ হাজার কিউবিক মিটার গ্যাস উৎপন্ন হবে। উৎপাদিত গ্যাসের অধিকাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা হবে। এই প্রকল্প সফল হলে নগরীর বিভিন্ন স্থানে আরো কিছু প্লান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা সিটি করপোরেশনের রয়েছে।

সাঙ্গু নদীর উপর দিয়ে তৈপার দ্বীপ - চাঁদুপর ব্রীজ তৈরির কাজ চলছে। ৪৩৪ মিটার দীর্ঘ এই ব্রীজটির নির্মাণ কাজ শেষ হলে জেলার বাঁশখালী, লোহাগড়া, সাতকানিয়া, চান্দনাইশ এবং আনোয়ারা উপজেলা এবং কক্সবাজার জেলার সাথে বন্দর নগরীর যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে।

কর্ণফুলী নদীর উপর তৃতীয় ব্রীজ স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

বন বিভাগের সামজিক বনায়নের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জেলার গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকার জনগণ অত্যন্ত উপকৃত হচ্ছে। সামাজিক বনায়নের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীরা সড়ক ও বাঁধের ঢালে বিভিন্ন রকম গাছ যেমন মেহগনি, শিশু, পেয়ারা, বাবলা, নিমগাছ এবং বিভিন্ন রকম সবজি যেমন বেগুন, টমেটো, মিষ্টি কুমড়া লাগিয়ে

থাকেন। সবজির পুরোটাই উপকারভোগীরা নেন। গাছের মালিকানা হয় যৌথ। গাছের যিনি রক্ষণাবেক্ষণ করছেন তার মালিকানা ৫৫ শতাংশ। বন বিভাগের ১০ শতাংশ, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের ৫ শতাংশ, বাঁধ বা সড়কের মালিক সংস্থা ২০ শতাংশ এবং অবশিষ্ট ১০ শতাংশ পায় বন বিভাগের ট্রি ফার্মিং ফান্ড। এই প্রক্রিয়া বর্তমানে অত্যন্ত সাড়া জাগিয়েছে।

তবে বন্দর নগরী হবার কারণে ও লোকজনদের সচেতনতার অভাবে চট্টগ্রাম জেলার বিপুলসংখ্যক অধিবাসী এইডস রোগের মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন।

জলবায়ুর পরিবর্তন, নদী প্রবাহ হ্রাস, নদী প্রবাহের দিক পরিবর্তন, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে চট্টগ্রাম জেলার বিপুল এলাকা হুমকির সম্মুখীন। সম্প্রতিক কালে ঘটে যাওয়া সুনামি তথা সমুদ্রের তলদেশের ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাস চট্টগ্রামবাসী তথা উপকূলবাসীকে এক ভয়াবহ বিপদের আশংকায় ফেলে দিয়েছে। এ রকম সুনামি যদি বাংলাদেশ উপকূলে আঘাত হানে তবে অবর্নণীয় ক্ষতি সাধন হবে।

দর্শনীয় স্থান

চট্টগ্রামে অনেক আকর্ষণীয় পর্যটন স্থান আছে। এই জেলার ফয়'স লেক, ফৌজদারহাট সী-বিচ, বাটালি হিল, দেব পাহাড়, কোর্ট হিল, ডিসি হিল জেমস ফিনলে হিল, পাহাড়তলীর ভৈপুয়ার দীঘি, আগ্রাবাদের ঢেবার পাড়, পতেঙ্গার সী-বিচ পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় স্থান।

ফয়'স লেক : মনোলোভা ফয়'স লেক অনেক আগে থেকেই পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছে। পাহাড়সারির মধ্যে লেকের স্বচ্ছ জলরাশিতে নৌকা নিয়ে বিচরণ সত্যি ভ্রমণপিয়াসীদের মন ভুলিয়ে দেয়।

পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত: পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত দেশী বিদেশী পর্যটকদের জন্য একটি আকর্ষণীয় স্থান। সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের মনোরম দৃশ্য দেখার জন্য পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত উপযুক্ত স্থান। সৈকত থেকে হঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়ে জাহাজ চলাচল। পতেঙ্গা থেকে ফৌজদারহাট পর্যন্ত ২১ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সৈকতে শীতকালে প্রতিদিন প্রায় ১০,০০০ পর্যটক আসে। কিন্তু এখানে পর্যটকদের জন্য তেমন কোন সুবিধা নেই বললেই চলে। অবৈধ দোকান-পাট গড়ে ওঠার ফলে সৈকতের সৌন্দর্য্য অনেকখানি নষ্ট হয়েছে। পর্যটকদের নিরাপত্তারও ঘাটতি রয়েছে। সন্ধ্যার পর প্রায়শই ছিনতাই রাহাজানি হয়ে থাকে।

বাটালি হিল : বাটালি হিলের চূড়ায় উঠলে দেখা যায় চট্টগ্রাম মহানগরী নদী, পাহাড়, সমুদ্র, দক্ষিণাঞ্চলের দূরবর্তী পাহাড় ও উপত্যকা।

পার্কি সমুদ্র সৈকত : চট্টগ্রাম শহর থেকে ১৬-১৭ কিলোমিটার দক্ষিণে আনোয়ারার গহিরায় অবস্থিত সমুদ্র সৈকত পার্কি ইতোমধ্যে পর্যটকদের নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছে। ১৯৯১ সালের প্রলয়ংকরি ঘূর্ণিঝড়ের পর উপকূল রক্ষার স্বার্থে বাংলাদেশ বন বিভাগ এবং গহিরা এলাকার জনসাধারণ যৌথ উদ্যোগে এখানে বনায়ন করা হয় এবং পরবর্তীতে অবসর বিনোদন কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। এখানে লাগানো ঝাউ গাছগুলো বড় হয়ে উঠলে এখানের পরিবেশ পাল্টে যায়। রঙিন কাঁকড়ার ছুটোছুটি, সূর্যাস্তের মনোহর দৃশ্য, সৈকতে ঘোড়ায় চড়া, জীপ চালানো, স্পীডবোটসহ সাগরের বুকে ছুটে বেড়ানোসহ এখানকার অনেক কিছুই পর্যটকদের কাছে আর্কষণীয়।

বামেরছড়া - ডানেরছড়া ইকো পার্ক : চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য ঘেরা মনোরম পর্যটন স্পট বামেরছড়া ও ডানেরছড়া এলাকায় ইকো পার্ক তৈরির পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে আগামী তিন বছরের মধ্যে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। এর মধ্যে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৫ কোটি ২৮ লাখ টাকা এবং জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ২১ লাখ টাকা। জানা যায়, মূলত বামেরছড়া ও ডানেরছড়া প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিলো সেচ প্রকল্প হিসেবে। প্রথমে এলজিইডি কাজ শুরু করলেও পরে এখানকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বন বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়। লেকের জলরাশি, কাশফুলের দৃশ্য, বন্য প্রাণীর কোলাহল - এ স্পটের সৌন্দর্য্যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সুউচ্চ পাহাড়ের উপর দিয়ে খালি চোখেই দেখা যায় অদূরে বঙ্গোপসাগরের অপূর্ব দৃশ্য। ইকো পার্ক সৃষ্টির প্রকল্প শেষ হলে এই এলাকা দেশী-বিদেশী পর্যটকদের কাছে আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

আনোয়ারার শোলকাটা : চট্টগ্রামের ইতিহাসের লোককাহিনী হিসেবে খ্যাত মনু মিয়া ও মালকা বানুর স্মৃতি বিজড়িত আনোয়ারার শোলকাটা গ্রাম দর্শনীয় স্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। চট্টগ্রাম শহর থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে এই গ্রাম অবস্থিত। অবসর বিনোদন এবং দর্শনীয় স্থান হিসেবে এখানে অনেকেই আসেন। মনু মিয়ার দীঘি ও মসজিদ সংস্কার করে এখানে চমৎকার পিকনিক স্পট গড়ে তোলা সম্ভব।

ঐতিহাসিক স্থাপনা : চট্টগ্রামে বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনা রয়েছে, যেমন ব্রোঞ্জ মূর্তি (৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে নির্মিত, আনোয়ারা উপজেলায় অবস্থিত), ফকিরা মসজিদ (হাট হাজারীতে অবস্থিত), মুসা খান মসজিদ (১৬৫৮ সালে নির্মিত), কুরা কাটনি মসজিদ (১৮০৬ সালে নির্মিত), কালা মসজিদ (১৬শ শতাব্দীতে), ছুটি খান মসজিদ (মীরসরাই), কদম মোবারক মসজিদ (১৭১৯), আন্দার কিল্লা মসজিদ, ওয়ালি খান মসজিদ (১৭৯০), বার আউলিয়া দরগাহ, বকসী হামিদ মসজিদ (১৫৬৮ সালে নির্মিত, বাঁশখালীতে অবস্থিত), চট্টগ্রাম কোর্ট বিল্ডিং (১৮৯৩), কলেজিয়েট স্কুল, জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর (১৯৭৪), জিয়া স্মৃতি জাদুঘর ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে চট্টগ্রাম বোদ্ধ মন্দির ও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্ন স্থান। এসব স্থানগুলোকে সংরক্ষণ করা হলে পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় স্থানে পরিণত হবে।

ওয়ার সিমেট্রি : দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের স্মৃতিবিজরিত এই কবরস্থানে ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে নিহত ৭৫৫ জন সৈনিকের কবর আছে। প্রতি বছর অনেক পর্যটক এই স্থান ভ্রমণে আসেন।

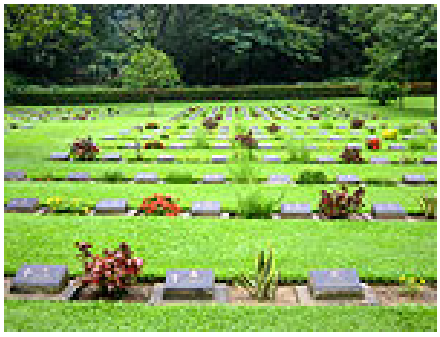

জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর : চট্টগ্রামের জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরটি এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম জাদুঘর হিসেবে স্বীকৃত। ১৯৬৫ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসীসহ বিশ্বের মোট ২৭টি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবন প্রবাহ ও তাদের স্থাপত্য নিদর্শন এখানে প্রদর্শিত হয়েছে।

জিয়া স্মৃতি জাদুঘর : জিয়া স্মৃতি জাদুঘরটি প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জীবন ও কর্মের উপর ভিত্তি করে চট্টগ্রামের সার্কিট হাউজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সার্কিট হাউজটি নির্মিত হয়েছিলো ১৯১৩ সালে। সার্কিট হাউজের মূল ভবনটি বাংলো টাইপের দোতলা। দৃষ্টিনন্দিত এই ইমারতটি ভ্রমণকারীদের দৃষ্টি সহজেই কাড়ে।

লালদীঘি : ব্রিটিশ আমলে স্থাপিত লালদীঘি অতীত ঐতিহ্যের স্বাক্ষর হয়ে আজও বিদ্যমান। এর চারপাশে রয়েছে মনোরম পার্ক। পার্কের পশ্চিম পাড়ে একটি মসজিদ। লালদীঘির পার্কটি ১৯৯৭ সালের শেষের দিকে ভারতের জয়পুরের পঞ্চ সিরি অনুকরণে পুনর্নির্মাণ করা হয়।

চট্টেশ্বরী কালী মন্দির : দক্ষিণাঞ্চলের পাহাড়ি নৈসর্গিক পরিবেশে কোতায়ালী থানার দামপাড়ায় চট্টেশ্বরী কালী মন্দিরের অবস্থান। আজ থেকে প্রায় দু'শ বছরের প্রাচীন মন্দির। এখানে ৪টি শিব মন্দির ও ১টি নাট মন্দির রয়েছে।

সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস-সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিডিও-আইসিজেডএমপি) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)-র একটি প্রকল্প। এটি একটি বহুখাত ভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগ। একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি এবং একটি টেকনিক্যাল কমিটির নির্দেশনায় এটি পরিচালিত হয়। আনুষ্ঠানিক ভাবে এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে ফেব্রুয়ারি, ২০০২ সালে।

উপকূলীয় উন্নয়নের সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি পরিবেশ তৈরী করা যেখানে টেকসই জীবিকা উন্নয়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে উপকূলীয় এলাকার উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করা যায়।

এই প্রকল্পের কর্মকাণ্ডকে ছয়টি কর্মসূচীতে ভাগ করা হয়েছে-

- উপকূল অঞ্চল নীতি প্রণয়ন
- উপকূল অঞ্চলের জন্য কর্মকৌশল প্রণয়ন
- উপকূল অঞ্চলের উন্নয়নে বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন
- উপকূল অঞ্চলের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
- প্রতিষ্ঠান ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা
- একটি সমন্বিত জ্ঞান ভাণ্ডার

বর্তমানে প্রকল্প থেকে বহু বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনসহ উপকূল অঞ্চল নীতি প্রণীত হয়েছে। উপকূল অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের রূপরেখা প্রণয়নে উপকূলীয় এলাকার গণমানুষের পরামর্শ ও মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই প্রকল্প শুরুর সময় থেকে আজ অবধি সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা ও জেলাবাসীর অংশগ্রহণে অনেকগুলো বৈঠক, গবেষণা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরই ধারাক্রমিক বিবরণ নীচে তুলে ধরা হল।

আঞ্চলিক গোল টেবিল বৈঠক, চট্টগ্রাম	**ডিসেম্বর, ২০০১**
উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী অধ্যয়ন	**জুলাই-আগষ্ট, ২০০২**
চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প : একটি কেস স্টাডি	**ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল, ২০০৩**
উপকূলীয় জেলার বিপদাপন্নতা কারণ অধ্যয়ন	**জুলাই, ২০০৩**
খসড়া উপকূল অঞ্চল নীতির উপর জেলা পর্যায়ে মতবিনিময় সভা	**অক্টোবর, ২০০৩**
উপকূল অঞ্চল কৌশলের উপর আঞ্চলিক প্রাথমিক মতবিনিময় সভা, চট্টগ্রাম	**অক্টোবর, ২০০৪**

জনসাধারণের সার্বিক অবস্থা জানার লক্ষ্যে পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার বিষয়টি এখানেই থেমে নেই। প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে চলতে থাকবে। খুব শিগগিরই প্রকল্প ও জেলাবাসীর অংশগ্রহণে অংশীদারদের আলোচনা, উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হবে।